শারদ সংখ্যা ১৪৩০

বই কুটির কলকাতা

:: ভূমিকা ::

"বই কুটির কলকাতা" একটি মঞ্চ। যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৫ই আগস্ট ২০২০ সালের মহামারীর আবহের মধ্যে দিয়ে। এরপর বিভিন্ন ধাপের উপর ভর করে আজ "বই কুটির কলকাতা" তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে চলেছে। বিস্তার হতে চলেছে এক নতুন রূপে, এক নতুন আঙ্গিকে। ভরসা রাখুন যেন "বই কুটির কলকাতা" তাদের নিজস্ব গড়িমা বজায় রাখতে পারে। মহামারীর সময় ছোট্ট এক ফেসবুক পেজ থেকে শুরু হয় আমাদের যাত্রাপথ। অচেনা মানুষদের অপ্রকাশিত ছোট ছোট কবিতা, ছড়া ও অনুভূতি গুলি ছিলো আমাদের মূল উপকরণ। প্রথমার্ধে প্রায় ২০০ টির বেশি লেখা আমাদের পাঠকদের ভালোবাসা কুড়িয়ে ছিলো দু-হাত ভরে। তাই সেই ভালোবাসাকে পাথেয় করে "বই কুটির কলকাতা" এগিয়ে যেতে চায় তার দিগন্ত বিস্তৃত প্রকাশনী জগতের দিকে। এখন আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের কাছে একমাত্র ভরসা।

দেখতে দেখতে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি আমাদের অষ্টম তম পত্রিকা "শারদ সংখ্যা ১৪৩০"। এটি আমাদের শারদীয়ার তৃতীয় সংখ্যা। তাই আপনাদের কাছে আবেদন থাকবে প্রতিবারের মত এবছরও আমাদের শারদ সংখ্যা ১৪৩০ যেনো আপনাদের আশীর্বাদ প্রাপ্য হয়। আপনাদের সামনে নতুন নতুন লেখকদের নতুন লেখা প্রকাশ করার প্রচেষ্টাই হল আমাদের মূল অঙ্গীকার। তাই সেই প্রচেষ্টায় আজ আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একমাত্র আমাদের চেষ্টা ও আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের ইচ্ছে ও নতুন লেখকদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। কারণ আমরা মনে করি প্রত্যেক মানুষেরই এই পৃথিবীতে জন্ম হয় তাদের শৈল্পিক সত্তা সমেত। শুধুমাত্র অভাব লক্ষ্য করা যায় একটি মঞ্চের। আমরা আশা করব আগামী দিনে আপনাদের "বই কুটির কলকাতা" হয়ে উঠবে অনেক উদীয়মান লেখক, লেখিকা ও শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের মঞ্চ এবং বাংলা প্রকাশনী জগতে যুক্ত হবে এক নতুন পালক।

***

-: সম্পাদকীয় :-

প্রিয় বন্ধু,আমি সীমন্ত রায়, সম্পাদক “বই কুটির কলকাতা”। মহামারী কবলে তৈরি হওয়া আমাদের এই ছোট্ট প্রচেষ্টাটি আজ অনেকের স্বপ্ন পূরণের মঞ্চে পরিণত হয়েছে। আজ প্রায় তিন বছর ধরে আপনাদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসায় প্রকাশ করতে পেরেছি আমাদের এই তৃতীয় বছরের “শারদ সংখ্যা ১৪৩০”। প্রতিকূলতার বাধা কম ছিল না, “বই কুটির কলকাতা” আজ এক এক করে সেই প্রতিকূলতাকে জয় করতে সক্ষম। যারা ভেবেছিল এটি শুধুমাত্র একটি অবসরের ইচ্ছে মাত্র, আজ সেইসব ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত করেছে “বই কুটির কলকাতার”। প্রথমে ফেসবুক পেজ, ওয়েবসাইট এরপর এক বিরাট সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছে “বই কুটির কলকাতার”। আপনাদের খুব খুশির সাথে জানাতে চাই আগামী কিছু মাসের মধ্যেই “বই কুটির কলকাতা” আত্মপ্রকাশ করবে এক প্রকাশনী সংস্থা হিসেবে। এবং প্রকাশিত হবে বই। গত তিন বছর যাবত অসংখ্য লেখক, লেখিকা ও চিত্রশিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছে “বই কুটির কলকাতার”। সেই সুবাদে তাদের অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশ করেছে “বই কুটির কলকাতা” নিয়মিত। গত আটটি সংখ্যায় যে সমস্ত লেখক, লেখিকা ও চিত্রশিল্পীরা আমাদের সাথে বিশ্বাসের স্বাক্ষর রেখেছেন তাদেরই ভরসা এবং ভালোবাসায় আমাদের এই পদক্ষেপ। সমস্ত প্রকার পরিকল্পনা চলছে এবং কিছু পরিকল্পনা ইতিমধ্যে সম্পন্ন। আর কিছু দূর এগোলেই পৌঁছে যাবো আমাদের স্বপ্নের দিকে।

শুধুমাত্র প্রকাশনী নয় “বই কুটির কলকাতা” ছড়িয়ে পড়বে তাদের নানাবিধ কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে নানান রূপে। তাই নতুন আঙ্গিকে আমাদের সকল দর্শক, চিত্রশিল্পী ও পাঠক, পাঠিকাদের কথা মাথায় রেখে “বই কুটির কলকাতার” এই নতুন আত্মপ্রকাশ। আবারও আমাদের সকল পাঠক, পাঠিকা ও চিত্রশিল্পী সহ যারা এই “বই কুটির কলকাতা”কে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন তাদের সবার প্রতি রইল আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পাশে থাকবেন ও ভালোবাসবেন।

***

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ওয়েবসাইট পরিচালনায়

দৈতা দত্ত

প্রচ্ছদ অঙ্কন

জুনালী বেজ

শারদ সংখ্যায় ছবি গুলি উপহার দিয়েছে কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টাকী বয়েজ স্কুল (শিয়ালদহ) স্কুলের ছাত্ররা।

প্রিয়াংশু কুন্ডু (ক্লাস – IV)
শুভজিৎ দাস (ক্লাস – V)
শিবাদ্রি দাস (ক্লাস – IV)
কৌস্তুভ রায় (ক্লাস – IV)
রুপম বিশ্বাস (ক্লাস – IV)
উজ্জ্বল সরকার (ক্লাস – IV)
সুমিসতো দাস (ক্লাস – IV)
সৌম্যদীপ রায় (ক্লাস – IV)
সৃজন দত্ত (ক্লাস – IV)
সোহম দত্ত (ক্লাস – IV)
শুভম (ক্লাস – IV)

সূচিপত্র

কবিতা

আমার দুর্গা	নিলেশ নন্দী
কবি ও কবিতা	মহ: রহিম শেখ
বছর চারেক পর	ডঃ মৌটুসী রায়
রাখি বন্ধন	মীর শাহানাজ খাতুন
সাঁঝ	জাহাঙ্গীর আলম সুলতান
টাকার কথা	সাবু সিদ্দিক
শৈশবের দিনগুলি	সৈয়দ হুমায়ূন রানা
গদ্য কবিতার ইতিহাস	পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়
শালপাতার ঠোঙা	শেখ সিরাজ
প্রতিফলন	গোলাম রসুল
খোলাম কুচি	মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার আমি	অলিভিয়া
ভালোবাসার রূপ	শেখ শাখাওয়াত আলী
নীলকন্ঠী নারী	রঞ্জিত কুমার বন্দোপাধ্যায়
অতীশ শ্রীজ্ঞান	দীপঙ্কর বিশ্বাস
প্রিয় বন্ধুর জন্য	নীতা কবি মুখার্জী

ছোটদের জন্য

বিশু যখন বিড়াল অজন্তা প্রবাহিত

ছোট গল্প

ইনায়েতের ইবাদত অজন্তা প্রবাহিত

শুধু মনে পড়ে "স্কুলের বন্ধুরা" সীমন্ত রায়

গল্প

প্রেম তৃষ্ণা সৈয়দ হুমায়ূন রানা

হিজল কন্যার প্রেম কাহিনী মহ: রহিম সেখ

বিশ্বাস ঘাতক সুনন্দ সান্যাল

জ্ঞানের কথা(G.K.)

টিপুর বাঘ ও **হাতি শুঁড়**

PILOT

আমার দুর্গা

নীলেশ নন্দী

আমার দুর্গা বড়ই সাহসী,
করে অন্যায়ের প্রতিবাদ,
পথের ধারের শিশুটিকে দেখে
কেঁদে ওঠে তার প্রাণ;
আমার দুর্গা যাবতীয় কাজ
দুহাতে নেয় সামলে,
দয়াময়ী তার কেঁদে ওঠে প্রাণ
মানুষের ক্লেশ দেখলে;
আমার দুর্গা মানবী তবু
সকলের কাছে দেবী,
প্রতিদিন মনে নিষ্ঠাভরে
তার পুজো করি।

কবি ও কবিতা

মহঃরহিম সেখ

কই কবি তোর কবিতা খানি
পড়তো দেখি আজ
রাত্রি আকাশ মেঘে ঢাকা
হানতো দেখি বাজ!
কৃষ্ণ মেঘ ঘিরেছে আকাশ
করেছে সে আজ দখল
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি আন তুই
কর দেখি মেঘ কতল।
কই কবি তোর কবিতা খানি
পড়তো দেখি আজ
কেমন ক্ষুরধার কবিতা
কেমন কর্ম কাজ?
আয় দেখি তোর কবিতাখানি
কেমন গর্জন করে
নাকি বন্দী খাঁচায় মেকি কান্নায়
বুক ভাসিয়ে মরে?
আয় কবি তোর আন কবিতা
বিদ্রোহে চড়া সুর
অত্যাচারীর দূর্গ ভেঙে
কর দেখি ভাঙচুর।
কত সুজন সজন হারা
শুন্য মায়ের কোল
আয় কবি আয় আজ কবিতায়
বিদ্রোহের আওয়াজ তোল।
মুখোশধারীর মুখোশ খুলে
দে দেখি তুই আজ
তোর কবিতায় পুড়ে মরুক
সকল ধড়িবাজ।
মানব হয়ে দানব যারা
করছে মানুষ খুন
দে মুখে তুই ঝাওয়া ঘসে
হোক কালি মুখ চুন।
আন দেখি তুই কি লেখেছিস
তোর কবিতায় গান
মরা গাঙে উঠুক জোয়ার
কাঁপুক সবার প্রাণ।

বছর চারেক পর

ড: মৌটুসী রায়

চেনা হাতের নরম আর হাত ধরলো না:
ভীষণ ভয় তোমায় তাড়িয়ে বেড়ালো
বার বার তোমাকে আমার থেকে সরিয়ে নেওয়া
ভীষণ ভয় তোমার সত্তাকে তাড়িয়ে বেরাল-
বছর চারেক পর মোর চোখ দুটো ভালো করে দেখতে পেলাম না -

ভীষণ ভয় তোমাকে আবার দূরে পাঠালো-
আজকের কৃষ্ণ র সমাজকে ভীষণ ভয়
রাধা কে আবারো সে অশ্রু সাগরে ভাসিয়ে দিল-

রাখী_বন্ধন

মীরশাহানাজ খাতুন

আমার কাছে আসবে তুমি ভাই
এই শ্রাবণের দিনে।
ঝরো ঝরো ঝরবে বৃষ্টি সোহাগ
ভরে বাঁধবে রাখী বোনে।।

বারিধের ঘন ঘটায় বাজবে
নূপুরের ছন্দে গান।
অটুট থাকবে চিরদিন ভাই
বোনের এই বন্ধন।।

বকুলের ঝরা পাতার সাথে
নাচবো আমি আনন্দে।
চারিদিকে মৌ মৌ করবে
আমার রান্নার গন্ধে।।

সোহাগ ভরে আদর দিয়ে
কাটাবো সুখ দিগন্তে।
কতই না উপহার দেব
তোমার অজান্তে।

মুক্ত ঝরার মত তোমারই হাসি।
বোনেরা তোমাদের কতই
না ভালবাসি।।

মেঘ যাবে দূরে নীলিমার
বুকে চাঁদ হাসবে।
বছরের পর বছর এই
দিনটি ফিরে আসবে।।

যুগে যুগে আলো দিয়ে
চলে যাবে চাঁদ।
হাজার ও সাল জি ও ভাই
রইল আমার আর্শিবাদ।।

কাঁচের ফাটা চুড়ি রাখিনি
কোনদিন হাতে।
শুনেছি প্রবাদ বাক্যে ভাইয়ের
রক্ত শুকাবে শরীর হতে।।

স্নেহের পরশ দিয়ে ললাটে
এঁকে দেব চন্দন।
কোনদিন যেন না ছিঁড়ে ভাই
বোনের এই রাখী বন্ধন।।

সাঁঝ

জাহাঙ্গীর আলম সুলতান

দিনের শেষে আস্তে করে
নামে যখন সাঁঝ।
ক্লান্ত কৃষক বাড়ি ফিরে
ফেলে মাঠের কাজ।

আকাশের ঐ ঘুড়ি গুলো
নামে মাটির পর।
ঘামে ভেজা পথিক শ্রমিক
ছোটে আপন ঘর।

সঙ্গে নিয়ে নানান রঙের
মহিষ গরুর পাল।
গৃহের পানে চলছে ধেয়ে
সমস্ত রাখাল।

গায়ে মেখে লালিমা ওই
রক্ত গোধূলির।
ঝাকে ঝাকে পাখিরা যায়
আপন আপন নীড়।

ঘরে ঘরে উঠছে জ্বলে
সন্ধ্যা প্রদীপ ওই।
বাঁশ বাগানে পাখপাখালি
করে যে হইচই।

অবশেষে সব কোলাহল
থামে সকল সুর।
মসজিদ হতে ভেসে আসে
আযান সুমধুর।

টাকার কথা

সাবু সিদ্দিক

বুক ফুলিয়ে বললো সেদিন টাকা
আমি ছাড়া জীবন সবার ফাঁকা।

শুনে ক্ষিপ্ত,সোনা, চাঁদি এসে
গম্ভীর হ'য়েবললো মুচকিহেসে।

আমার গায়ে দিতে এলে হাত
বুঝবে ঠ্যালা, হবে কুপোকাত।

টাকা কিন্তু ছাড়ার পাত্র নয়
উচ্চস্বরে ঘোষনা ক'রে কয়।

তোমরা দু'জনে আমার মতো নও
চিরটা কাল বন্দী হ'য়েই রও।

হঠাৎ কারো বিপদ এলে পরে
লাগেনা কাজে, থাকো যতই ঘরে।

সোনা, চাঁদির বড্ড হাসি পায়
হাসিতে তাদের,দ্যুতি যে ছড়াই।

তোমায় পেতে ঘাম ঝরাতে হয়
ভোট বাজারে, মানুষ হয় ক্ষয়।

ক্ষমতা পেতে, সন্ত্রাস, রাহাজানি
সবই কিন্তু, টাকার জন্য মানি।

সত্যি কথাটা বলতে বড়ো ভয়
রাজা হন বধির, করেন অভিনয়।

সোনা, চাঁদি মানলো এবার হার
টাকা ধর্ম, টাকায় কর্ম,টাকা যে সার।

শৈশবের দিনগুলি

সৈয়দ হুমায়ুন রানা

ছিল ভালো শৈশবের দিনগুলি
খেলাধুলায় কাটতো বেশ;
কবে যেন বড় হলাম
আনন্দ খুশির দিনগুলি শেষ।

দাদুর বাড়ির বেল তলায়
কাটতো মোদের দিনগুলি;
পুতুল খেলা মজার ছিল
খেলতাম ক্রিকেট, ডাংগুলি।

বেলগুলি বেশ ফুটবলের মত
ছিল খুব মিঠা;
এমন বেল খেলামনাকো আর
পাইনিকো আর দুইটা।

শৈশব কৈশোর পেরিয়ে এখন
ঠেকেছে আমার তিনকালে;
এখনও বেল তলায় এলে
ঘিরে ধরে মায়াজালে।

গদ্য কবিতার ইতিহাস

পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়

গাছেদের পাড়া ঘুরে ঘুরে যায় রাতপাখিদের শিষ
সেখানেই নীলা ফেসবুকে লেখে কবিতার বন্দিশ

চুল মেলে দেয় নিশির কুটিরে, গোপন অঙ্গবাস
প্রাচীন গাছের গুড়িতে লিখছে, নীলা তার ইতিহাস

চাঁদের আগুনে নীলা খুঁজে পায় একমুঠো সাদা খই
তারার কান্না শিশিরে ভিজলে খড়কুটো ভাসে কই

মৌনীরাত্রি, নীলা খুঁজে কাকে, হৃদয়ের ভেজা ঘামে
কবেকার প্রেম আজো পড়ে আছে নীল রংচটা খামে

নীলার শব্দে গুমড়ায় মেঘ নেই যার চালচুলো
জেগে জেগে ওঠে বেপরোয়া যত গদ্য কবিতাগুলো

নীলার গদ্যে বৃষ্টির তানে টোল পড়ে স্মিতগালে
দুঃখরা হাঁটে মৃত্যু মিছিলে সেগুনের মগডালে।

শালপাতার ঠোঙা

শেখ সিরাজ

আমি শালপাতার ঠোঙা
জন্ম আমার বনে,
শিল্পীর দয়ায়-
আমার সভ্য সমাজে স্থান।
সুস্বাদু রকমারি খাবারে
মোড়ক হয়ে আমি ঘুরি
বাবুদের হাতে হাতে -
তাদের উষ্ণ পরশে মন ভরে যায়,
কিন্তু উদর ভরে না।
প্রয়োজন মিটে গেলেই
ছুঁড়ে ফেলে দেয় ড্রেনে বা ডাস্টবিনে।
অভুক্ত কুকুরের দল -
আমায় নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করে,
তখন আমি ভাবি -
না, এখনও আমার অস্তিত্ব আছে।
হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে
আমার ছিন্ন - ভিন্ন দেহটা।
কোন জ্বলন্ত আগুনে পড়লেই
আমি দপ করে জ্বলে উঠি।
আমার অন্তরের চাপা ক্ষোভ
তখন যেন এক বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

প্রতিফলন

গোলাম রসুল

পাথরের প্রতিফলনে আমি
না খোলা না বন্ধ চোখ
দুটি চোখ মিলিত হয়েছে সেই গভীর মোহনায়
আর সেখানে সূর্যের প্রখর তাপ
একটা পাখি গান গেয়ে জুড়িয়ে দিচ্ছে আকাশ
আকাশ গরম একটি পাত্রের মতো
যার গায়ে দগদগ করছে পাখিদের উড়ার দাগ

দিন রাত্রি
মাঝখানে কোনো সেতু নেই
বাতাসকে বললাম পাথরসহ আমায় তুলে নাও
শন শন শব্দগুলো ভিক্ষুকের মতো বেহালা বাজিয়ে চলে গেল

এবার শস্য দানার মতো অসংখ্য পৃথিবী
জানি না কোনটাতেই বসবাস করছিলাম

খোলামকুচি

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় রায়

জীবন বড় অস্থির খড়কুটো আর খোলামকুচি
পদ্মপাতা সে তো দামী তাই কচুরপাতায় জল ই মানি।
এক জীবন যে বড় ছোট দেখতে দেখতে চলে যাওয়া
ভুলগুলো সব খোঁচাখাওয়া আধখাওয়া ফল সুমিষ্ট।
কারেকশন আর কালেকশনে ভর্তি পেশেন্ট জিমখানা
সুগার প্রেসার আগছার শ্বাসের প্রক্রিয়াটা ই অজানা।
বয়সে আর চুল পাকে না নড়বড়ে হাঁটু বলিরেখা উধাও।
অভাব বলে তো কিছু নেই তবু পাওয়ার সবটা স্বভাব।
চলতে গেলে কমসেকম টু হুইলার সাথে মাথায় রোদবাঁধ
ফিরতে গেলে ও যতই হুল্লোড়, লাগে নিঝুম চারটি কাঁধ।
যতই বিবেক খোলামকুচি আপন পর হিসেব চুকে
এখনো শেষ কাজটা উদ্ধার রকে বসা ওরাই করে ।
সবই যদি আকাশ ছোঁবে মাটির কান্না জবজপে
গুনের কদর ভিন্ন মাতামাতি গদগদ অন্তরে।
ভাগ্যিস হয়নি সব মেধা ফাটকার এলেবেলে কিছু বলার
মুশকিল হতো তবে সুখ বাণিজ্যে ইউরো পাউন্ড ডলার।

আমার আমি

অলিভিয়া

মাঝেমাঝে খুব ইচ্ছে করে
দূরে কোথাও হারিয়ে যাই।
চেনা মুখগুলোর থেকে দূরে,
অচেনা মানুষের ভীড়ে।
খুব ইচ্ছে করে নিজের ভিতরের
"আমি" কে একবার নতুন করে আবিষ্কার করি।
মাঝেমাঝে খুব একা থাকতে ইচ্ছে করে।
কথা বলতে চাইলেও, শব্দেরা হরতাল ডাকে।
তখন প্রিয় মানুষগুলোর মুখ আর
চোখে ভাসে না।
লিখতে ভালো লাগে না।
সাজতে ভালো লাগে না।
কচি কলা পাতা রঙের শাড়িটাও
কেন জানি মন ভালো করতে পারে না আমার।
লিখিত সংসারের শক্ত শিকল ছিঁড়ে, একাকিত্বের ঘ্রাণ কাছে ডাকে।
ইচ্ছে করে সবুজ প্রকৃতির বুকে হারিয়ে যায়।
সমস্ত সাংসারিক জটিলতা থেকে দূরে।
আরো একবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করে সবুজ শৈশবের দিনগুলোতে।।

ভালোবাসার রূপ

শেখ শাখাওয়াত আলী

যারা বোঝে প্রেম মানে,
শরীর ছোঁয়া ভালোবাসা,
তাদের কাছে প্রেম হল
কামনা আর লালসা।

শরীর ছোঁয়া ভালোবাসা
পরকীয়া হতে পারে,
হৃদয় ছোঁয়া ভালোবাসা
ঐশ্বরিক চিরতরে।

যারা বোঝে প্রেম মানে
হৃদয় ছোঁয়া ভালোবাসা,
তাদের কাছে প্রেম হল
অন্তরের ভালোবাসা।

শরীর ছোঁয়া ভালোবাসায়
কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে,
হৃদয় ছোঁয়া ভালোবাসা
রঙিন মনের অনুরাগে।

এ দেহের কাম,লালসা
একদিন থেমে যাবে,
অন্তরের ভালোবাসা
আজীবন রয়ে যাবে।

শরীর ছোঁয়া ভালোবাসা
কামনায় কাছে টানে,
হৃদয় ছোঁয়া ভালোবাসা
বাঁচে দুটি অবুঝ মনে।

নীলকণ্ঠী নারী

রণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়

মনের দরজায় খিল দেব দেব করে
রাত্রি বারোটা হয়ে যায় আর ঠিক
ঐ সময় বিষধর কাল নাগ নাগিনীরা
হুট হাট করে চলে আসে ছোবল মারতে,
আমি মশারী খাটিয়ে ইষ্ট নাম জপ করি
তখন ঐ কাল সর্পগুলো প্রস্থান করে ।
আমি আর তখন আমাতে থাকি না
কৈলাসে শিবপত্নীর আঁচলে চলে যাই।

ইহলোকে এরূপ আঁচল পাবার প্রত্যাশায়
থাকলে তোমার হাঁড়ির অন্ন কার্বন হবে,
লোকে হাসবে গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত অবধি;
তুমি কাঁদবে নবান্ন না খাবার অপমানে।

এর অন্তর্নিহিত অর্থ তুমি বুঝবে না বেহুলা
তুমি পারলে এখন দেবতাদের হৃদয়ে আগুন ধরাও;
ওরা অর্থের প্রাচুর্যে বারুদ হয়ে আছে;
কেবল আগুনের প্রতীক্ষায়,ঘর্ষণ করলেই
তোমার অগ্নিমন তৃপ্তিলাভ করে শান্ত হবে।

একমাত্র এদের এটাই মহৌষধ,
নতুবা মনের আগুন কিভাবে নেভাবে তুমি?
এভাবে পৃথিবীকে নির্বিষ করা ছাড়া
উপায় নেই;একমাত্র নারীই পারে নীলকণ্ঠ
হয়ে পৃথিবীর জঞ্জাল সরাতে,নরের সাধ্য নেই।

অতীশ শ্রীজ্ঞান

দীপঙ্কর বিশ্বাস

কখনো নিজেকে নিয়ে ভাবিনি,
ধংস হয়েছি ইচ্ছে মতন!
নিজেকে নিজেই বিপথে ঠেলেছি
তাই হয়তো যা অধঃপতন!

আপন বুঝের আর কি সময় আছে?
বেহিসাবী থেকেছি সময়ে!
এতদিনে আমার যাই মন্দ হয়েছে
তাও রেখেছি স্মৃতির পটে!

স্মৃতির সাথে কাটাকুটি খেলব বলে
একটি কলম কিনব ভাবছি!
নিজেকে গড়ব কেমনে নতুন করে
ভালো কাজে সঙ্গী পাব কি?

পাপ-গুলোকে ঠেলে দূরেই ভাগাব
আমি তো পণই করেছি!
জীবনটা কতটুকু মূল্যবান জানব
তাই সুন্দর জীবনই চাইছি!

প্রিয় বন্ধুর জন্য

নীতা কবি মুখার্জী

বন্ধু তুমি সুখী হয়ো ভাই,
সুখী থেকো দেহে মনে,
সকল বন্ধুর ভালোবাসা নিয়ে
ভালোবেসো বন্ধু জনে।

বিলাসে, ব্যসনে, সুখ ও দুঃখে
সাথে থাকে যেইজন,
সেই তো প্রিয় বন্ধু রে ভাই
সেই তো আপনজন।

এই সমাজের অমোঘ সৃষ্টি
মিতা বলা হয় যাকে,
সুহৃদ, বন্ধু, সখা বলি আর
প্রিয়বর বলি তাকে।

মিতার উপমা পাই রে আমরা
গুহক মিতার নামে,
প্রভু রাম দিলেন হৃদয়ে ঠাঁই
ধন্য এ ধরা ধামে।

আরেক উপমা কৃষ্ণ সুদামা
মহাভারতের লেখা,
কৃষ্ণার্জুন ছিলেন যে তাঁরা
অনন্য-হৃদয় সখা।

আজ সবই মেকি, হৃদয়হীন
বন্ধুত্বের মেলা,
স্বার্থপর এই দুনিয়াটাতে
বন্ধুত্বের অবহেলা।

পৃথিবীর মানুষ কিছু তো করো
প্রিয় বন্ধুটির জন্য,
বন্ধুর বিপদে মুখ ফিরায়ো না
হয়ো না যেন বন্য।

Class : IV
Sec'

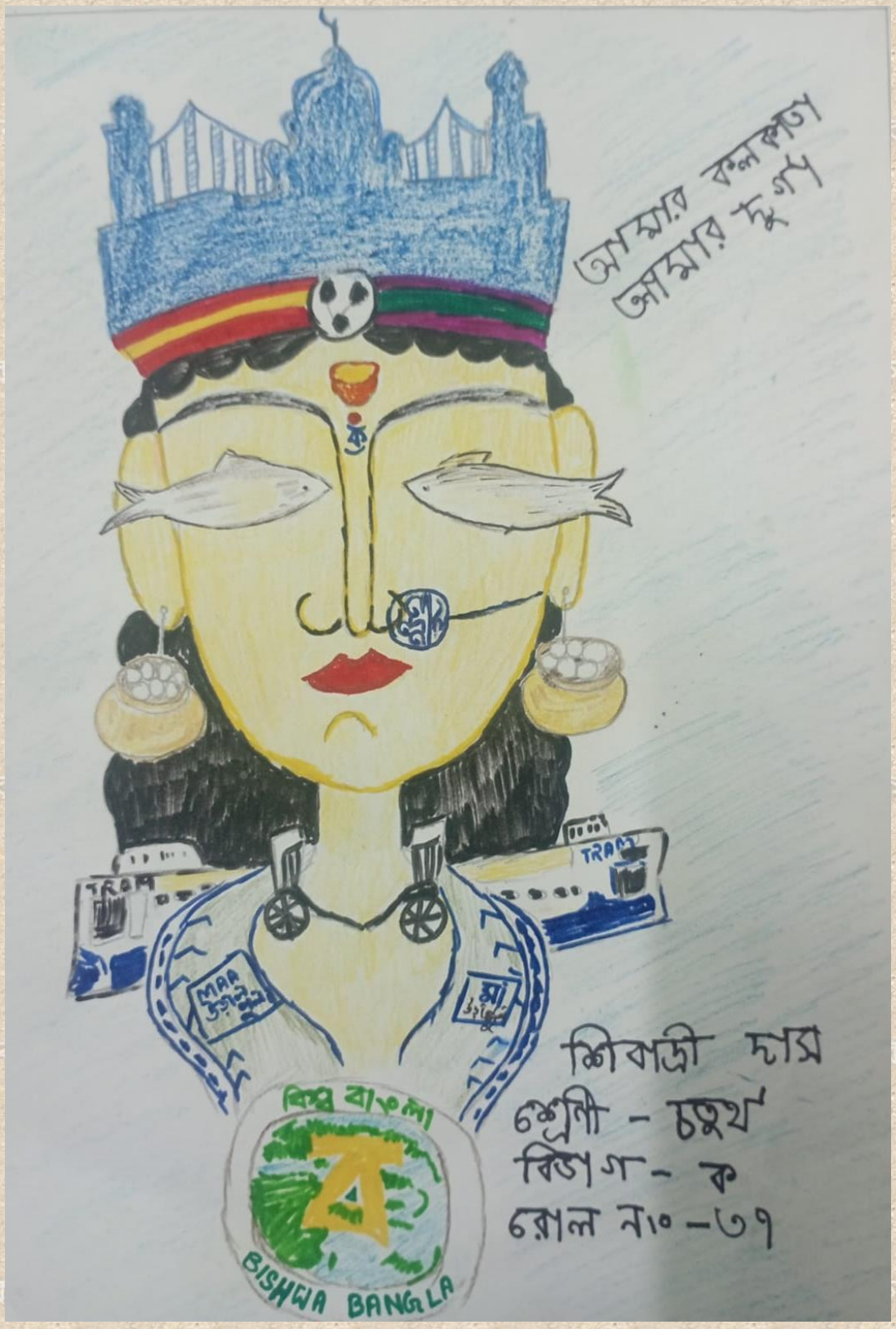
আমার কলকাতা
আমার দুর্গা
TRAM
TRAM
MAA
বিশ্ব বাংলা
BISHWA BANGLA
শিবাদ্রী দাস
শ্রেণী - চতুর্থ
বিভাগ - ক
রোল নং - ৩৭

বিশু যখন বেড়াল

অজন্তা প্রবাহিতা

গরমের ছুটি মানেই বিশুবাবুর দাদুর বাড়ি বেড়াতে যাওয়া । এবারেও ব্যতিক্রম হলো না । বছর শুরু হলেই বিশু ক্যালেন্ডার ওলটায়, দিন গুনতে শুরু করে । কবে এপ্রিল মাস আসবে কবে দাদুর বাড়ি যাবে ।

বিশু বাবা মায়ের সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে থাকে । ক্লাস ফোরে পড়ে । দাদু দিদা থাকে সুদূর আসামের তৈলনগরি ডিগবয়ে।

কোভিডের দুবছর দাদুর বাড়ি যাওয়া হয় নি ,এবারে হচ্ছে , তাই, আনন্দে পা আর মাটিতে পড়ে না । দাদুর সঙ্গে ভিডিও কলে অনেকবার বেড়াল ছানাদের দেখেছে এবারে স্বচক্ষে দেখতে পাবে ।

দুবছর আগে যখন ডিগবয়ে গেছিলো তখন ‘সুন্দরী’ অনেক ছোট্ট ছিল। পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে ম্যাও ম্যাও করতো। এখন পাঁচ বাচ্চার মা ।

বাচ্চাগুলো কি সুন্দর হয়েছে । একটা কলোসাদা, দুটো গাঢ় বাদামী, একটা একদম ধবধবে সাদা আরেকটা ছাই রঙের ।

দাদু ওদের জন্য বড় কাঠের বাক্স বানিয়ে দিয়েছে । ওতে সুন্দরী তার ছানাপোনাদের নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে আর খিদে পেলে দিদার পেছন পেছন ম্যাও ম্যাও করে ঘুরঘুর করতে থাকে ।

দাদু কতরকমের মাছ নিয়ে আসে ওদের জন্য । সুন্দরীর খুব নাক উঁচু। বাসি মাছ খায় না । বেশি তেলথাকা মাছ খায় না । বেশি কাঁটা থাকা মাছ খায় না । দাদু বলে ,তুই বেড়ালের নামে কলঙ্ক। যে মাছ দেবো, সেই মাছ খাবি, এত বাধবিচার কিসের ? জানিস না, মেয়েদের এতো খুঁতখুঁতে হতে নেই। দিদিকে দ্যাখ সব খাবার খায়।

কোন বেড়ালের কি নাম রাখবে ভাবতে ভাবতে ফ্লাইটের সময় কোথা দিয়ে কেটে গেলো বিশু বুঝতেও পারলো না । এবারে বিশু বেশ স্বাবলম্বী। একাএকাই ট্রলি বের করে লাগেজ বেল্টে দাঁড়িয়ে পড়লো। লাগেজ নিয়ে বাইরে আসতেই দেখে দাদু আর সুমু মামু অপেক্ষা করছে । মোহনবাড়ি থেকে ডিগবয় পৌঁছাতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে গেলো। রাস্তায় কত চা বাগান। সবুজ ,সবুজ আর সবুজ । উঁচু নীচু রাস্তার পাশে সবুজ চায়ের বাগানও ঢেউ খেলে যায় সেসব দেখলে মন হারিয়ে যায় রূপকথার দেশে।

বাড়ি পৌঁছুতেই গরমজলে ভালো করে স্নান করে , ছোলার ডাল আর আলুভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে বিশু বেড়াল পর্যবেক্ষণ শুরু করলো ।

নতুন মানুষ দেখে বাচ্চাগুলো প্রথমে একটু সিঁটিয়ে থাকলেও দু তিন দিনের মধ্যে ওদের সঙ্গে বিশুর ভাব হয়ে গেলো ।

বিশু ঘুমিয়ে থাকলে ওরাও টুপ করে বিছানায় উঠে পড়ে আর এসব দেখলে দিদা খুব রেগে যায় । বেড়াল নিজের বিছানায় শোবে ।

দাদু ওদের তাজা মাছের সঙ্গে প্যাকেট ক্যাটফুড পিওর পেট অথবা হুইস্কাস খাওয়ায়। চৌকো চৌকো বিস্কুটের মত খাবার। বিশু একদিন একটা ছোট্ট টুকরো মুখে দিয়ে দেখে বেশ খেতে তো।
এক দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে মা আর দিদা কোথাও বেরিয়েছে আর দাদু ঘুমিয়ে পড়েছে । কি করি, কি করি , ভাবতে ভাবতে বিশু ক্যাট ফুডের প্যাকেট থেকে কয়েক মুঠো খেয়ে ফেললো । বেড়াল যদি খেতে পারে তাহলে মানুষের খেলে দোষ কি ?

পাছে দাদু জানতে পারে তাই প্যাকেটখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে চুপটি করে শুয়ে পড়লো।

সন্ধেবেলা বেড়ালদের খাবার দিতে গিয়ে দাদু দেখে প্যাকেট প্রায় ফাঁকা। বেড়াল তো নিজে নিজে আলমারি খুলে প্যাকেট খুলে খাবার খেতে পারে না । তাহলে এই খাবার কে খেলো ?
এই খাবার গুলো আমাজন থেকে অর্ডার দিয়ে আনাতে হয় কাছের কোনো দোকানে পাওয়া যায় না । মা ,দিদা বাড়ি ফিরে সব শুনে সব বুঝতে পারলো। কিন্তু, বিশুকে কেউ কিছু বললো না ।

এঘর-ওঘর ঘুরঘুর করতে করতে হঠাৎ বিশুর কানে এলো মা ফিসফিস করে দিদাকে বলছে , শিবরাত্রির দিন জন্মেছিল বলে তুমি আদর করে নাম রাখলে বিশ্বনাথ । সেই বিশ্বনাথ কিনা বেড়ালের খাবার খেয়ে নিলো। এখন যদি ওর বেড়ালের মত গোঁফ গজায় , গলার স্বর বেড়ালের মত হয়ে যায় , আমায় ' মা ' বলে ডাকতে না পারে ,ম্যাও ম্যাও করে ,তাহলে কি হবে ? আমি আমার বিশুকে কোথায় পাবো ? নিয়ে এলাম ছেলে, হয়ে গেলো বেড়াল । তোমার জামাইকে কি বলবো ? সঙ্গে নিয়ে ঘুমোতেও পারবো না , ওকে তো তাহলে স্টোররুমে সুন্দরীর বর 'মোটামুখ হুলোর ' পাশে বিছানা করে দিতে হবে ।

দরজায় আড়ি পেতে সব শুনলো বিশু । এবার খুব ভয় করতে লাগলো । গলার কাছটাতে কেমন ব্যথা করছে মনে হলো । ঠোঁটের ওপর হাত বুলিয়ে মনে হলো কেমন সরু সরু গোঁফ । সেই রাতে বিশু ভালো করে খেতে পারলো না । দিদা চিকেনের ঝোলটা খুব টেস্টি রান্না করেছিল , কিন্তু ,পছন্দের চিকেন সেদিন ফ্যাসকা মনে হলো।
সেদিন রাতে দেরি না করে বিছানায় চলে গেলো বিশু। মা ডাকলো, বিশু ঘুমিয়ে পড়েছিস?
'হ্যা ' বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ম্যাও ।
মা ছুটে গেলো দিদার কাছে । ওমা ,আমার বিশু সত্যি বেড়াল হয়ে গেছে ।
দিদা চমকে গেলো ,দৌড়ে এসে ডাকলো , দাদুভাই , ও দাদুভাই ।
ম্যাও ম্যাওও ..... ম্যাও ।
'"দাদুভাই " , দাদু ডাকলো ।
"ও দাদুভাই চোখ খোলো , দেখো সারপ্রাইজ , তোমার বাপি এসেছে ।
" বাপি , তুমি ।"
ছুট্টে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বিশু ফুঁপিয়ে বলে উঠলো, আমি আর ক্যাট ফুড খাবো না ।

***

ইনায়েতের ইবাদত

অজন্তাপ্রবাহিতা

ইনায়েতের বয়স সাত। বাংলাদেশের ঢাকার এক মফস্বলে তার বাড়ি। রোজ সন্ধেবেলা মায়ের সঙ্গে টিভিতে খবর দেখে। খবর গুলো দেখার পর ছোট্ট মাথায় নানান প্রশ্ন ঘুরপাক খায়।

- কালীপূজা একদিনের জন্য ক্যান হয় আম্মু ?

- অমাবস্যি একদিন থাকে তাই ।

- আমাদের গ্রামে কালীপূজা হয় না ক্যান ?

- পূজা করনের কেউ নাই তাই।

- ক্যান নাই ?

- তা কইতে পারুম না। অখন এই ফালতু কথা লইয়া প্যাচাল না পাইরা নামতা গুলি মুখস্থ কর দেখি। আমি ভাত বওয়াইয়া

আইয়্যা কিন্তু পড়া ধরুম।

কিছুক্ষণ বাদে ,

- ইনায়েত অ ইনায়েত। পড়ার আওয়াজ নাই ক্যান ?

- নামতা মুখস্থ হইয়া গ্যাসে। খুদা লাগসে, ভাত লইয়া আসো।

- আর এট্টু সময় সবুর কর মা, বাংলা কবিতা গুলান পড়।

- একপায়ে দাঁড়িয়ে /সব গাছ ছাড়িয়ে /উঁকি মারে আকাশে।

আম্মু,একটা কথা জিগাই ?

- হ ! ক ! আপ্পুমনি কৈসিলো আমাদের দ্যাশের জাতীয় সঙ্গীত আর ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ল্যাখসিল। অদের ঠাকুর আমাগো ঠাকুর কি আলাদা ?

- না ,একই মানুষ।

- তুমি জানো, আমার বন্ধু কার্তিকের বাপের হার্ট অপারশন কলকাতা থেইক্যা করাইসে। অখনে এক্কেবারে ভালো। আব্বু কবে থেইক্যা পায়ের ব্যাথায় কষ্ট পাইতাসে, কলকাতায় ডাক্তার দেখাইতে যাইবা ?

- ভারতে যাইতে হইলে পাসপোর্ট লাগবো। আমাগো উহা নাই।

- পাসপোর্ট কি হয় ?

- অন্য দ্যাশে যাওনের কাগজ। অখনে প্রশ্ন থামাও । ভাত খাওয়া হইয়া গ্যাসে, গিয়া শুইয়া পড়। সকালে উঠতি না পারলি ইস্কুল যাইবা ক্যামনে। পড়াশুনা না করলে চার ক্লাসে উঠবা ক্যামনে ? তিন ক্লাসেই রইতে হইবো।

- আম্মু।

- কি হইল! অখনো ঘুমাস নাই ?

- না। তুমি রোজ নামাজ পড়ো কেন ?

- সক্কলের জন্য দুয়া চাই। ইবাদত করি সক্কলে যেন ভালো থাহে , সুস্থ থাহে ।

- আমরা বাংলায় কথা কই, হ্যারাও বাংলায় কথা কয়। আমাদের রবিঠাকুর অদের রবিঠাকুর এক। কিন্তু অদের দ্যাশে যাওনের লাইগ্যা কাগজ লাগে ক্যান ? আমি রোজ ইবাদত করুম, বড় হইয়া বিনা কাগজে আব্বুরে য্যানো কলকাতায় লইয়া যাইতে পারি।

- এইবার কথা আর চোখ দুয়োটাই বন্ধ করো।

- রোজ কত কি ঘটে যাহা/ এমন কেনো সত্যি হয় না আহা/ ঠিক যেনো এক গল্প হতো তবে / শুনত যারা অবাক হতো সবে .....।

- অখনে ঘুমারে ইনায়েত , ম্যালাই রাত হইসে।

- শুনত যা আ আ আ রা.....।

***

প্রেমতৃষ্ণা

সৈয়দ হুমায়ুন রানা

।। এক ।।

অতীতের ' জাগাল ' নামক প্রথার ট্র্যাডিশান এখনও গ্রামাঞ্চলে সমানে চলেছে। জাগাল বলতে সাধারনত : বুঝি জমির ফসল রক্ষককে। খেত - খলিয়ান পাহাড়াদার। দিবা - রাত্রি মাঠের ফসল দেখাশোনার দায়িত্ব জাগালের উপর বর্তায়। শীত-বর্ষা-গ্রীষ্মেও ফসল পাহাড়ার হেরফের হয় না। নির্জন রাত্রিতে মাঝের মধ্যে রণ হুঙ্কার ওঠে শুনশান চরাচরে - 'কে-রে-রে '..... সেই ডাকে চোরেদের পিলে চমকে যায়। তাদের দূরভিসন্ধি পরিত্যাগ করে , ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পিঠটান দেয়। জাগালদের জাগতিক যত সুখ-দুঃখ মাঠকেন্দ্রিক। দিনমান কাটায় মাঠের মাঝে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরে। ফসল উঠলে, মানুষের কাছে চুক্তিভিত্তিক দুই/চার মন ধান বা চাল তাদের পাওনা । তাতেই চলে জাগালদের পরিবার। মোটা ভাত-কাপড়েই সংসার অতিবাহিত হয়। তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ কেইবা রাখে?

হিজলের বিলটা প্রশস্ত; মাইল চারেক মতো হবে। এর বুক চিরে দ্বারকা নদী প্রবাহমান। বর্ষার সময় ব্যতীত সারাবছর হাঁটুজল থাকে। মানুষজন , পশুর পাল সহজেই পারাপার হতে পারে। নদীর দুই পাড়ে দুটি গ্রাম। পূর্ব পাড়ে সাঁওতাল আদিবাসীদের গ্রাম সূর্যপুর। পশ্চিম পাড়ে মুসলমান প্রধান গ্রাম খাসপুর । এই হিজল বিলটা দেখভালের জন্য দুই গ্রাম থেকে দুইজন জাগাল নিযুক্ত করা হয়েছে। সুর্যপুর থেকে পরাশর মুর্মূ আর খাসপুর থেকে শোভান আলি। এরা দু'জনে কুস্তিগীর এবং লাঠিয়াল। দু/দশটি গ্রামে নামডাক আছে। বিশ/পঁচিশ বছর ধরে ওরা এই বিলের ফসল রক্ষনাবেক্ষণ করছে। আজ পর্যন্ত কোনো চুরির ঘটনা ঘটেনি। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছে ওরা।

শোভান আর পরাশরের বর্তমান বয়স হয়েছে যথেষ্ট। তবুও জাগালির কর্ম খুব দক্ষতার সঙ্গে করে । কর্মে কোনো প্রকার গাফিলতি নেই। শীত হোক কিংবা বর্ষা। ওরা খুব ভালো বন্ধু। শোভান প্রায়ই দিন পরাশরের বাড়ি গিয়ে নেশা করে আসে। তালের রসের তাড়ি। পরাশরের বাড়িতে তৈরী হয়। ওর বাড়ির সামনে বিশাল একটা বটগাছ আছে। সেই ছায়াশীতল স্থানে আদিবাসী সাঁওতালরা নেশা করে, শুয়ে বসে আড্ডা দেয়। পরাশর ওদের মাথা। গরীব আদিবাসী সাঁওতালদের মোড়ল। সূর্যপুরের লোকজনের সুখে-দুখে পরাশর থাকে। ঝগড়া-কাজিয়ায় বিচারও করে দেয়। লোকে ওকে খুব মান্য করে। ....

আজ জাড়টা ঝাঁকিয়ে পড়েছে। শোভান কালো একটা কম্বলে শরীর ঢেকে , লাঠিটা বাগিয়ে সহসা চিৎকার করে উঠলো :- " কে-রে-রে " ওপরে নদীর বাঁধে বসে পরাশর প্রত্যুত্তরে বললো - হোই , হোই... এ যেন দুই বাঘের গর্জন। এমন ডাক সবাই ডাকতে পারে না, ফাটা বাঁশের বাঁশির মতো সুর কেটে যায় অন্যদের। এমন ডাক শুধু শোভান ও পরাশর ডাকতে পারে। আজ বিশ্ব/ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা। সারাটা চরাচর জোৎস্নালোকে ধূ-ধূ করে জ্বলছে । আলোকের প্লাবন চারিদিকে । শোভান এগিয়ে গিয়ে নদীর পাড়ে দাঁড়ায়। পরাশর বলে,"শোভান ভাই এল্যা নাকি হে? এসো দুটান মেরে যাও।" সে গাঁজায় ছিলিম সাজিয়ে জোরে, জোরে টানছে আর খুক্ খুক্ কাশছে। শোভান প্রত্যুত্তরে বলে, "পরাশরদা আমি এল্যাম বলে , তুমি জিইয়ে রাখো- নিভেনা যেনু।" সে দ্রুত নদীর জলে ছপ্ ছপ্ পা ফেলে এগিয়ে যায়। নেশার টান বড় বস্তু! এত ঠান্ডায় তবুও শোভান হিম জল পার হয়ে ওপারে পৌঁছে যায়, গঞ্জিকাসেবনের লালসায়। পরাশর আহ্লাদিত স্বরে বলে,-"এসো হে এসো, লিভেনি এখুনও। তুমার লেগে জিইয়ে রেখেছি।" শোভান ওর হাত থেকে কলকেটা নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে টান দেয়। নেশার মৌতাতে ঠান্ডা ভাগানোর প্রচেষ্টা। ওরা দুজনে হাত বদল করে, গঞ্জিকাসেবনের আনন্দে মেতে উঠলো। এই নেশা যারা করে, তারা বোঝে এর আনন্দ! অন্যদের কাছে এই নেশা, ঘৃন্য একটা নেশা ছাড়া কী হতে পারে।

।। দুই ।।

আজকাল সূর্যপুরের আদিবাসী সাঁওতালদের ছেলে মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে। অতীতের মতো এত গ্রাম্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন কাটাতে অভ্যস্ত নয় এরা। ঢের উন্নতি হয়েছে। মাটির লেপা পোছা বাড়ির পরিবর্তে সুন্দর, সুন্দর পাকা বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে স্টেশনারি দোকান, দাতব্য চিকিৎসালয়, পশু চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। তবুও পরাশরের মদের আসর বেশ চলেছে। ওর বাংলা মদের ব্যবসা চলে রমরমিয়ে। তালরসের টকে যাওয়া তাড়ির খদ্দেরও বেশ জোটে। তালরসের সিজিনে । পরাশর মুর্মূ সাঁওতালদের সর্দার। ওর একমাত্র মেয়ে শ্যামলী এবারে মাধ্যমিক দিয়েছে। শোভানের ভাইপো শফিক এর সঙ্গে পড়তো।পরাশের বাড়িতে আশা যাওয়া আছে ওর।শ্যামলীর মা শফিককে ছেলের মতো ভালোবাসে।শোভনের ভাইপো হবার সুবাদে।শফিকের আসা যাওয়া সাঁওতাল পাড়ায় কেও খারাপভাবে নেয়নি । পরাশের মুখের উপর কথা বলার কারো হিম্মত হয়নি এদ্দিন।

শ্যামলীর ইচ্ছে নার্স হয়ে আর্ত মানুষের সেবা করার। শফিক পড়াশোনায় ভালো,সে শিক্ষক হতে চায়।ওর বংশের লোকেরা অশিক্ষিত। চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করে।কেউ,কেউ কুস্তি,লাঠি খেলায় সুনাম অর্জন করেছে।কুনাম ও যথেষ্ট আছে।শফিক শিক্ষিত হয়ে বংশের বদনাম ঘোচাতে চায়। বাবা নূর হোসেন, ছেলের জন্য গর্বিত।

শ্যামলীকে মন দিয়ে বসেছে শফিক।সে কথা শ্যামলীও টের পেয়েছে।শ্যামলীর অমত নেই কিন্তু মুখের কোনো প্রত্যুত্তর পায়নি শফিক।সে এতটাই ভালোবেসেছে যে দ্যাখা না হওয়া ক' টাদিন তর সয়ছেনা।প্রায়শই শ্যামলীদের বাড়ি নানা বাহানায় হাজির হয় গিয়ে।মায়ের সামনে সব কথা হয়না । ও শফিককে নিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে বসে। সবুজ ঘাসের উপর বসে দুটি মনের ভালোলাগা,ভালোবাসার কথা গুলি আদানপ্রদান করে।বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসে।মুসলিম গ্রাম খাসপুর থেকে মসজিদের আজান ভেসে আসে।সূর্যপুরের বাড়ি গুলো থেকে শাঁখের ধ্বনি জানান দেয় সন্ধ্যে সমাগত।শ্যামলী বাড়ী ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে।শফিকের গল্প করে মন ভরেনা। শ্যামলীকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে। সে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।শফিককে এক ধাক্কায় ঠেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায় ভীত হরিণীর মত।শফিক হেসে ওঠে ,হাত তুলে বলে, আবার কাল আসব। দেখা হবে। শ্যামলী কোনো উত্তর দেয়না।দ্রুত বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

শ্যামলী শফিকের ভালোবাসাটা এইভাবে গাঢ় হতে থাকে দিনকে দিন। গ্রামের লোকের নজর এড়ায়না ।তবুও কেউ মুখের সামনে কিছু বলতে সাহস পায়না, পরাশের মেয়ে বলে। অন্য কেউ হলে, বেঁধে মারধোর করতো। বেজাতের সঙ্গে প্রেম- পিরিতি করা ঘুচিয়ে দিত।এটাই আদিবাসী গ্রামের নিয়ম,সামাজিক রীতি-নীতি।

।। তিন ।।

জাড়টা আজ যেনো বেশীই পড়েছে। শোভান গাঁজায় টান মেরে এসে কুড়েঘরে শুয়েছিল।ঠান্ডায় ঘুম আসছিলো না। বেয়াড়া ট্রাকগুলো ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ছুটে যাচ্ছে।গাড়ির টায়ারের শব্দে শোভান বিরক্তি প্রকাশ করে,"ধূস শালা!'বলে ওঠে বসে ।কালো কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে, কুড়ের বাইরে বেরিয়ে শুকনো কাঠে আগুন জ্বালায়। জোৎস্না রাত্রি।গোটা চরাচর আলোর ছটায় ধপধপ করছে।শোভান আগুনে হাত-পা ছড়িয়ে স্যাঁকে। ওপার থেকে পরাশর চেঁচিয়ে বলে," কি হলো,আজ বেশী জাড় লাগছে নাকি হে?"

---"ধূস শালো! আজ চোখে ঘুম ধরেনা। জাড় তো লাগছেই লাগছে,শালার গাড়িগুলোর টায়ার যেনু গিলতে আসছে! আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।" শোভান উত্তরে বলে। পরাশর বটগাছের নীচে, খড়ের উপর কম্বল বিছিয়ে গায়ে কাঁথা চাপিয়ে শরীরটা টানটান করে শুয়ে পড়ে বলে:"আমি একটুন চোখ বুঁজল্যাম ভাই। তুমি আগুন স্যাঁকো তবে।"

সেইকথার প্রত্যুত্তর না করে শোভান চেঁচিয়ে ওঠে: কে .. রে ..রে .. রে.... বিদঘুটে সেই চিৎকারে,জলাভূমির নির্জন প্রান্তর কেঁপে ওঠে যেন।

যৌবনের সেই তেজ আর নেই। তবুও যা আছে, সেটা মনোবল । সাধারণ মানুষের কাছে লাঠিয়াল,কুস্তিগীর শোভান এখনও আতঙ্কের। মানুষ আজও ভয়ে ভক্তি করে। একসময় থানার বড়বাবু ঘন,ঘন ফোন করে, তার খোঁজখবর রাখতেন । বড়ো কোনো ডাকাতি বা খুন খারাবির তদন্তে শোভানের ডাক পড়তো থানায়।সে বহু কেসের তদন্তে পুলিসের সহযোগিতা করেছে। বকশিস পেয়েছে ।এখনও থানার সঙ্গে ভালরকম যোগাযোগ আছে লাঠিয়াল শোভানের।

চোখে ঘুম ধরছেইনা যে !সে আগুন সেঁকতে ,সেঁকতে অতীতের বহু ঘটনা মনে করতে থাকে।ঘটনা গুলো এঁকে এঁকে চোখের সামনে ছবি হয়ে ভাসছে। একবার সাঁতলা ব্রীজের কাছে লড়াই প্রতিযোগিতা হচ্ছিলো। শোভান গ্রামের লোকের সঙ্গে দুই ক্রোশ পায়ে হেঁটে গেছিলো সেই লড়াই দেখতে। দূর,দূরান্তের বড়, বড় নামজাদা পালোয়ানেরা কুস্তি করতে এসেছে। শোভান মাঠের পাশে বসে বাদাম খাচ্ছিলো কলকাতা থেকে গামা পালোয়ান এসেছে।সে মাঠে নেমে একমুঠো মাটি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে, সেই মাটি শোভানের গায়ের উপর তাচ্ছিল্যভাবে ছিটিয়ে দিয়েছিল। শোভানের সারা গা-ময় মাটিতে ভরে যায়। সে ক্রুধস্বরে গামা পালোয়ানকে গালি দিয়ে বলেছিল, " এই শালা চোখের মাথা খেয়েছিস নাকিবে? তোর গা - ঢুকিয়ে দিব।" গামা পালোয়ান মৃদু হেসে দুই হাতে তাল ঠুকে লাফিয়েছিলো। নিতান্তই অবজ্ঞা ভরে। তাতেই শোভান ক্ষেপে যায়। সে ছুটে গিয়ে, পালোয়ানের গলা টিপে ধরে। আর তাতেই দক্ষযজ্ঞ বেঁধে যায়। কুস্তি শুরু। ঢাক বাজে শব্দ করে। মানুষের হাসির হিড়িক পড়ে যায়। তরুণ যুবক শোভান কোলকাতার গামা পালোয়ানকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। অনেকক্ষণ প্যাঁচ খেলার পরে , গামা চিৎপটাং ! লোকজন তুমুল চিৎকারে ধরণি কাঁপিয়ে তোলে। একজন পালোয়ান শোভানের মেডেল ঝুলিয়ে দিয়ে, ওকে কাঁধে তুলে মাঠ পরিক্রমন শুরু করে। লোকজন হাততালি দিয়ে উল্লাসে মত্ত। আর গামা পালোয়ান মুখ কালো করে, ময়দান ত্যাগ করেছিলো।.... বহুদিন পরে , সেই স্মৃতি মনে পড়তে শোভানের হাসি পেল।

নিজের শরীরের দিকে চেয়ে রইলো করুন দৃষ্টিতে। এখন দুমুঠো ঠিকমত ভাত জোটে না। দুধ, ঘি তো স্বপ্ন এখন। বাপের কথা মনে পড়তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ; বিষন্ন হয়ে উঠলো মনটা। হায়াতের একমাত্র সন্তান ছিল শোভান । বাপের আদর যত্নে মানুষ হয়েছিল সে। বাড়িতে গরু পুষতো হায়াত। ছেলের জন্য দুধ, ঘির কোনো খামতি রাখেনি। আজ বাপের কথা খুব মনে পড়ে। শোভানের দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

অপ্রত্যাশিতভাবে শোভান ভূত দ্যাখার মতো চমকে উঠলো। দুজন নর-নারী কিছুটা তফাতে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। নদীর জল পার হ'বার সময় কোনো শব্দ হয়নি। শোভান বিস্মিত। সে হেঁটে যাওয়া নর-নারীর পায়ের দিকে তাকায়। ভূতদের পা গুলো পেছনের দিকে ঘোরানো থাকে। মাটিতে ওদের পা পড়ে না। বাপের কাছে শোভান শিক্ষা নিয়েছে। না, এরা ভূত নয়। নর-নারী। এতরাত্রে এরা কোথায় যাচ্ছে? ওর মনে কৌতূহল জাগে। শোভান চিৎকার করে প্রশ্ন করে - "কে গো তুমরা? এত রাতে কোথায় চলল্যা?" কোনো উত্তর না পেয়ে , শোভান লাঠি হাতে উঠে দাঁড়ালো। সে হাতে ধরা টর্চের তীব্র ফোকাস ফেলে ক্রধস্বরে গর্জে উঠলো :- " এই দাঁড়াও বুলছি, তুমাদের কানে কথা যায়না । কে তুমরা?"

ছেলে-মেয়ে দু'জন হাত ধরাধরি করে মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগে। ওরা ভয় পেয়েছে। শোভানের চিৎকারে পরাশরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে গলা ছেড়ে প্রশ্ন করে : "কী হয়েছে শুভানভাই ?" শোভান প্রত্যুত্তরে বলে -" দুজন ছেল্যা-মেঁয়্যা লদী পার হয়ে এসে, ছুটে পালাছে পাকা রাস্তার পানে। আমি দাঁড়াতে বুলতেই, ছুটে পালিয়ে যেল।" -" ঠিক আছে, আমি দেখছি।" কথাটি বলে পরাশর ওর মুঠো ফোন থেকে কয়েকজনকে খবরটি জানিয়ে দিল। ছেলে মেয়ে দুটোকে যেমন করেই হোক আটকানো চাই। ইতিমধ্যেই পরাশরের স্ত্রী মালতি দেবীর রিং এলো। পরাশর ব্যস্ততার সঙ্গে ধরে, প্রশ্ন করলো : কী ব্যাপার এতরেতে ফোন করেছো ক্যানে?" ওপার থেকে মালতী দেবী কুঁকিয়ে কেঁদে বলে : "শ্যামলীকে কুথাও খুঁজে পাওয়া যেছে না। তুমি কিছু ব্যবস্থা করো নাহ'লে আমাধের মুখ পুড়বে।" পরাশরের হৃদয়ে গিয়ে আঘাত লাগে স্ত্রীর কথাটি। সে দ্রুত ওঠে , নদী পার হয়ে এসে, শোভানকে কাছে ডেকে নিলো। ওরা পাকা রাস্তার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল । পরাশর ভীষণ উত্তেজিত। ওর ক্রধ মুখটা শোভান দেখতে পাচ্ছিলো না। সে জিজ্ঞেস করলো :- " কী হয়েছে পরাশরদা ? " ও চুপচাপ আলি পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল, উত্তর না দিয়ে । শোভান কথা বাড়াতে সাহস পায় না।

।। চার ।।

ছেলে মেয়ে দুটিকে একটা গাছতলায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই খাসপুর, রণগ্রামের বহুলোকজন সেখানে জমায়েত হয়েছিল। শোভান, পরাশর পাকা রাস্তার কাছে পৌঁছে হাঁপিয়ে উঠেছিল। শোভান টর্চ মেরে ছেলে মেয়ে দুটিকে দেখেই চমকে উঠলো । ওরা আর কেউ নয় ; পরাশরের মেয়ে শ্যামলী , আর শোভানের ভাইপো শফিক। নূর হোসেন দূরে দাঁড়িয়েছিল । দাদাকে দেখে এগিয়ে এলো। পরাশরের দুচোখ ভোরে জল এলো মেয়েকে দেখে। সে একদলা থুতু ফেলে বললো :- " ছিঃ মা ছিঃ তোকে কী ভেবেছিলাম আর কী করলি! বাবার মুখে চুন কালি লেপে দিলি শেষে? এর চেয়ে এক শিশি বিষ খাইয়ে মেরে দিলেই তো পারতিস মা। বুড়ো বয়সে মুখ কালো না করে, ল্যাটা চুকে যেত।" পরাশর শব্দ করে কেঁদে উঠলো। নূর হোসেন করজোড়ে বললো : " দাদা, এখুনও তেমুন বড় কিছু ক্ষেতি হয়নি। যে যার ঘরে চলে যাক। দুকান হবে না। অরা ছেলে মানুষ ভুল করে ফেলেছে । অদের ক্ষমা করে দেও দাদা।"

পরাশর উদাসভাবে আকাশের দিকে চেয়ে বললো: " ক্ষমা করার আমি কে ভাই? ক্ষমা করবে আমাদের সমাজ। আমি ওর বাবা হয়েও কেউ না। আমাদের সমাজের একটা আইন আছে। সেই আইন বড়ো কড়া। আমাদের আদিবাসীদের তা করতেই হয়।" কথাটি শোনার পর শোভান চুপচাপ মাঠের আলি পথ ধরে হাঁটা দিলো। সে জানে , পরাশরের মতো কঠিন মনের মানুষের মন ভেজানো বড় কঠিন। পরাশর যা বলে, তাই বেদবাক্য। শত প্রচেষ্টা করলেও বদলাবে না।

ইতিমধ্যে সূর্যপুর থেকে আদিবাসীদের আরও কয়েকজন এসে পৌঁছুলো। পরাশরকে দেখে প্রশ্ন করলো: " দাদা, উদের বসিয়ে রেখিন কী হবে? উদের গিরামে লিয়ে চলো।" পরাশর বললো: " হ , তাই চলো। উদের লিয়ে চলো।" নূর হোসেন এবারে হিংস্র ক্রোধে বললো : " খবরদার! আমার ছেল্যার গায়ে কেহু হাত দিব্যানা তাহলে খুনখারাপি হয়ে যাবে।" পরাশর বজ্রকঠিন সুরে বললো: " এই নূর হোসেন তুমি বাড়াবাড়ি করব্যানা। আদিবাসীরা হাতে চুড়ি পরে বসে লাই। তুমার ঘরে আমি যাই লাই। তুমার ছেল্যা আমার ঘরের ইজ্জত লষ্ট করেছে। সুতরাং, তুমাদের আমার বিচার মেনে লিতেই হবে। খুশি মুনে মেনে লেও ভালো নচেৎ যা ইচ্ছে হয় করে দেখতে পারো।" কথাটি শোনার পর, নূর হোসেনের মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুলোনা। আদিবাসী যুবক গুলো শ্যামলী আর শফিককে ধরে সূর্যপুরের দিকে হাঁটতে লাগলো। জমে থাকা মানুষের ভীড় ওদের পিছন, পিছন এগিয়ে গেল।

জনতার চিৎকারে শান্ত রাত্রি অশান্ত হয়ে উঠলো। দূর থেকে সেই কলরব শুনে শোভান প্রমাদ গুনলো। সে থানার বড়বাবুকে ফোন করে সবকিছু জানিয়ে দিলো। শোভান ওর ভাইপো শফিককে বড় ভালোবাসে। স্নেহের কাছে শাসন অনেক সময় হার মানে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। পুলিস সময় মতো এসে পড়লে, শফিককে উদ্ধার করা যাবে। ওরা তো নাবালক নয়, সাবালক। শ্যামলীকে গায়ের জোরে ভাগিয়ে নিয়ে যায়নি। ওরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে। আইন ওদের পক্ষেই রয়েছে। কিছু আদিবাসীদের আইন পৃথক। ওদের সৃষ্টি করা আইনেই দুজনের বিচার হবে। এখানেই শোভানের ভয়। সে ইচ্ছে করলে, সব পারে। কিন্তু, বিবেকের কাছে শোভান পরাজিত পরাহত। পরাশর ওর প্রাণের বন্ধু। তার কথার উপরে কথা বলতে চায়না। লাঠি তুলতে চায়না। শোভান আইনের উপর ভরসা করে। পুলিশ যা করার করবে। পরাশরের বাড়ির সামনে ঝাঁকড়া বটগাছ তলার বেদিতে শ্যামলী আর শফিককে বসিয়ে রেখে, গ্রামময় ঢাক পিটিয়ে লোক জড়ো করেছিলো আদিবাসী দুই যুবক। সূর্যপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এগিয়ে আসছিল সেদিকে।শ্যামলীর মা উচ্চসুরে কাঁদছিলো মায়ের মন। সেই অভাগিনী তো কাঁদবেই। ততক্ষনে ভোর হয়ে এসেছিলো। একটা পুলিশ ভ্যান এসে নদীর পাড়ে দাঁড়িলো। একদল পুলিশ নেমে, নদী পার হয়ে দ্রুত সূর্যপুরের দিকে এগিয়ে গেল। বড় বাবু অরিন্দম ঝাঁ সাহেব স্বয়ং এসেছেন। খুব কড়া মনের , দুঁদে অফিসার । ....

এদিকে কে যেন রটিয়ে দিয়েছে, সাঁওতালদের সঙ্গে খাসপুরের মুসলমানদের দাঙ্গা লেগেছে। শোভান জাগালকে খুন করে হিজল জলাভূমির মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। সুতরাং, কথাটি রাষ্ট্র হতে খাসপুরের মুসলমানরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সূর্যপুরের দিকে ছুটছিল। শফিককে ওরা বেঁধে রেখেছিল। ওর বাপ নূর হোসেন বাধা দিচ্ছিলো। সাঁওতালদের সঙ্গে বচসা চলছিল উচ্চস্বরে। খাসপুরের অবুঝ জনতা ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাঁওতাল আদিবাসীরাও তীর ধনুক নিয়ে তৈরী। ঢোল বাজিয়ে, শৃঙ্গার বাজিয়ে যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। পুলিস ততক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। ওসি অরিন্দমবাবু সার্ভিস রিভালবার তুলে শূন্যে ফায়ার করে, অশান্ত জনতাকে শান্ত হতে আদেশ দিলেন। এই গোলযোগের মধ্যে সামান্যতম সুযোগ খুঁজে, শফিক শ্যামলীর হাত ধরে নদীর দিকে ছুটে পালিয়ে গেল। নদী পার হতেই, ভূত দেখার মত চমকে উঠলো ওরা। শোভান লাঠি তুলে গর্জে উঠলো:"এই তুরা পালাবার চেষ্টা করবিনা খবরদার বুলছি। দাঁড়া চুপ করে।"

শফিক করজোড়ে অনুরোধ জানিয়ে বললো:" চাচা তুমি আমাদের যেতে দাও। আমাকে ওরা প্রাণে মেরে ফেলবে।" শোভান ধমকে উঠে বললো: " অন্যায় করার আগে সে কথা মুনে পড়েনি তোর? আমাদের মধ্যে

সুসম্পর্কটা নষ্ট করে দিলি শয়তান, কেন এমন করলি?" শফিক কেঁদে বললো: " ক্ষমা করে দাও চাচা, ভুল হয়ে গেছে।" শ্যামলীও করজোড়ে শোভানকে অনুরোধ করছিল । ওর দুচোখে জল। শোভান অনড়। ওসি সাহেবকে ফোন করে বললো:"সাহেব আপনি নদীর ধারে আসুন। আমি ছেল্যা-মেয়্যাদের ধরে রেখেছি। আপনি থানায় লিয়া যান তারপর আইন মোতাবেক যা বিচার করবেন সেটা আপনার উপর ছেড়ে দিল্যাম।" কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিস নদীর ধারে পৌঁছে ছেলে-মেয়ে দুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেল। যাবার সময়। ওসি সাহেব শোভানের পিঠ চাপড়ে সাবাসি জানিয়ে প্রশংসা করে গেল। পুলিসের গাড়িটা ধীরে, ধীরে মাঠের রাস্তা ধরে পাকা রাস্তায় গিয়ে উঠলো। দুপক্ষের ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত জনতা সেই দিকে উদাসভাবে চেয়ে রইলো অসহায়ভাবে। শ্যামলীর মায়ের বুক ফাটা আর্তনাদ নদীর ওপার থেকে ভেসে আসছিল। তখন দিনের আলো পূর্বাকাশে ফুটে উঠলে, সেই আলোকরশ্মি গোটা প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। এই মহৎ সংকেত যেন ভয়ংকর একটা বিপদ কেটে গিয়ে খুশির আলোকদ্যুতি হয়ে ঈশ্বর ছড়িয়ে দিলেন সবার চোখে-মুখে।

ছেলে-মেয়ে সাবালক সাবালিকা। ওরা উভয়েই পরস্পরকে ভালোবাসে মন থেকে। কোনো জবর দস্তি, গাজোয়ারি ভালোবাসা নয়। দুটি মনের পবিত্র প্রেম। সুতরাং, ওসি অরিন্দমবাবুর মন গললো। ওদের প্রতি মায়া হলো। তিনি দুই পক্ষকে থানায় ডেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, শফিক শ্যামলীর দুই হাত এক করে দিলেন। থানায় মধ্যেই বিয়ের শাঁখ বেজে উঠলো। মিষ্টি বিতরন শুরু হলো পুলিসকর্মীদের মধ্যে। শোভান হা-হা করে হেসে পরাশরকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। পরাশর অভিমানে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললো: "ধ্যুস ! শুমুন্দি তুকে কে বিহায় বুলবে রে শালো ? তুই তো আমার ভাই।" সে কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো।

***

স্কুলের বন্ধুরা

সীমন্ত রায়

শুধু মনে পরে সেই স্কুলে পড়ার দিন গুলি। কতই না বদমাইশি করতাম আমরা। এখন সেই তুলনায় অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছি। শান্ত হয়ে গিয়েছি দায়িত্ব বেড়ে গেছে বলে। শান্ত হয়ে গিয়েছি লোকে কি বলবে? সেটা বার বার মনে পড়ে বলে। আসলে সময়ের সাথে সাথে শান্ত হতেই হয়, নাহলে সবাই অশান্তির কারণ বানিয়ে দেবে আমায়। যাই হোক, আজ সব বন্ধুরা সবাই নিজ নিজ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। কেউ ডাক্তার, অনেকে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ব্যাবসা আর বাকিরা চাকরিতে আবদ্ধ। দেখা তো হইনা। বেচেঁ আছি শুধুমাত্র whatsapp আর face book-কে অবলম্বন করে। হয়তো এটাই শেষ অবলম্বন হয়ে থেকে যাবে আমাদের বাকি বন্ধুত্বের জীবনটায়।

মাঝে মাঝে ভাবি স্কুলে পড়া কালীন আমরা কোনো দিনও কি ভেবেছি? এমন একটা দিন আসবে যে আমরা এক সাথে আর ফুটবল খেলবো না, খেলবো না পেন-ফাইটিং, করবো না আউট হয়েছে কি হয়নি সে নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি। আসলে আমরা বড়ো হওয়ার কথা ভাবিই না। ভাবতে চাই না বড় হয়ে বাবার মত হওয়ার। আমরা কল্পনা করি শুধু, বাবাদের জীবন-শৈলিকে নিজের মতন সহজ করে নেওয়ার।

স্কুল জীবনে পুজোর প্রায় এক মাসের ছুটি গুলি ছিলো আনন্দের। তবুও দশমীর পর লক্ষ্মীপুজো শেষ হওয়া মাত্রই মনটা কেমন করতো স্কুল না যাওয়া নিয়ে। হয়তো আমরা কেউই সেই মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতাম না। তবে স্কুলের মাঠ, ফুটবল, নতুন জামা-প্যান্টের গল্প, ঠাকুর দেখার লিস্ট, লাস্ট বেঞ্চের কথোপকথন তখন খুবই হাতছানি দিত আমাদের।

আজ স্কুল ছেড়েছি তেরো বছর আগে। এখনও যখন স্কুলে যাই খুব মিস করি তোদের। মিস করি করিডোরে দৌড়ে বেড়ানোর জুতোর আওয়াজ, কলিং বেল। মিস করি টিফিনে আচার-য়ালার তেতুঁল, কুল, ice-পেপসি। মিস করি কাগজের বল, জলের বোতল আর নিম গাছ তলা। মিস করি আমাদের হারিয়ে যাওয়া, ঝগড়া করা আর পরীক্ষার হলে ফিস ফিস করে ডেকে ওঠা "ওই, এর উত্তরটা বল না"। ভালো থাকিস তোরা।

***

:: শতবর্ষে আবোল তাবোল ::

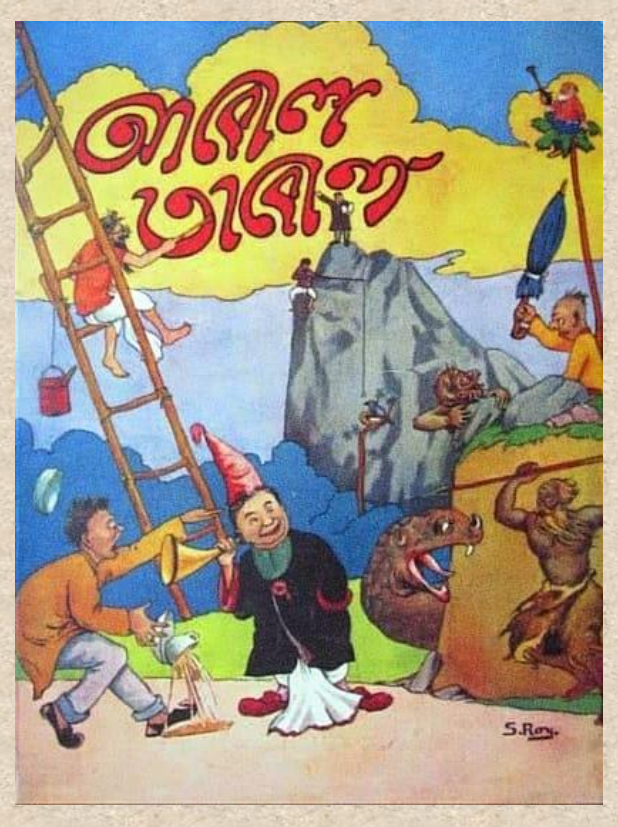

কাতুকুতু বুড়, কুমড়ো পটাশ, খুড়োর কল, কিম্ভুত ও হুকোমুখো হ্যাংলা এইসব চরিত্রের সাথে পরিচয় হয়নি এমন বাঙালি খুব কমই আছে। এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় দুটি আশ্চর্য বই ও একটি আশ্চর্য গল্পে। এই বই দুটি হল “আবোল তাবোল” ও “হ য ব র ল” আর গল্পটির নাম হল “হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি”। এদের স্রষ্টা হলেন সুকুমার রায়। আজ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ঠিক ১০০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে এই দিনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো “আবোল তাবোল”... যা আজও সমান ভাবে প্রযোজ্য।

তাই এই শতবর্ষ উদযাপনে বই কুটির কলকাতার তরফ থেকে সকল লেখক লেখিকা ও পাঠক সহ সমস্ত শিল্পীদের জন্য রইলো অনেক অনেক শুভেচ্ছা সহ অভিনন্দন।

হিজল কন্যার প্রেম কাহিনী

মহঃরহিম সেখ

ছোট মফস্বল শহর কান্দি।এই শহরেরই অন্তর্ভুক্ত এবং নিকটবর্তী হিজল অঞ্চল। তারই একটা বিস্তৃত জলাশয় হিজল বিল। এই রূপসী হিজল বিলকে নিয়ে কত না কবি, সাহিত্যিক,গল্পকার এবং উপন্যাসিক গল্প লিখেছেন তার ইয়াত্বা নেই।হিজল বিলকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই।হিজল বিলের নাম করণ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলে থাকেন, গভীর রাতে এই গাছ গুলি নাকি দূর আকাশে উড়ে যাচ্ছিল।যেতে যেতে এক সময় ভোর হয়ে যায় তখন ওই মুহূর্তে গাছ গুলি নাকি ওখানেই নীচে নেমে পড়ে।তার পর বহু বছর কেটে গেছে, তবুও আজ পর্যন্ত গাছ গুলো ওখানেই রয়ে গেছে।সত্যি বলছি আপনারা কেউ যদি মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার অন্তর্গত শাহাপুর গ্রামের কারুল বিলের বনে যান তবে ওই যাদুকরি গাছগুলো এখনও দেখতে পাবেন।ওই গাছে সম্বন্ধে আজও কান পাতলে একটা প্রবাদ শোনা যায়;কোন ব্যক্তি যদি ওই হিজল গাছের পাতা কিংবা তার ডাল পালা ভুল করে ভেঙে বাড়ি নিয়ে আসেন, তাহলে তার বাড়িতে হাওয়া বাতাস অশরীরী আত্মার রূপ ধারন করে এসে রোজ তাকে জ্বালাতন সৃষ্টি করবে।হিজল বিল নিয়ে নানান জনের মুখে নানান রূপ কথার গল্প শোনা যায়। এমন একটা ঘটনার কথা না বললেই নয়।

সালটা ১৯৭০ বা ৭১ হবে হয়তো!ওই গ্রামের তিন বন্ধু জাব্বার,রসিদ আব্দুল একই পাড়ায় তিন বন্ধু বসবাস করতেন।

একদিন তিন বন্ধুর মধ্যে তর্ক বাঁধল।তাদের মধ্যে মধ্যে কথা হল যে হিজল গাছের তলায় রাত্রি বেলায় যদি কেউ লাঠি পুঁতে আসতে পারে তবে তাকে এক কেজি রসগোল্লা পুরস্কার দেওয়া হবে।এই কথা শুনে রসিদ বলে, " এ আবার অসম্ভব কি!

রসিদের এই কথা শুনে তখন, দুই বন্ধু আব্দুল ও জাব্বার সম্মতি জানিয়ে বলে," বেশ তবে তাই হোক।

তারপর সেইদিন সেই রাত্রিতে রসিদ তার দুই বন্ধুকে সাক্ষী রেখে রাতের অন্ধকারে বনের গভীরে লাঠি পুঁততে চলে যায়।কিন্তু লাঠি পুঁততে গিয়ে তাড়াহুড়োর মাথায় সে লাঠিটা তার লুঙ্গির উপর পুঁতে ফেলে।আর সেটা রসিদ মোটেই বুঝতে পারেনি।এবার যখন সে উঠতে যাবে তখন তার মনে হল কে যেন তার লুঙ্গি ধরে টানছে।সঙ্গে সঙ্গে সে তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।দুই বন্ধু রসিদের ফিরে আসতে দেরী হওয়ায় ভাবনায় পড়ে গেল।

তখন দুই বন্ধু হাতে একটা লাঠি এবং তিন ব্যাটারী টর্চ নিয়ে তাকে খুঁজতে বনের মধ্যে চলে গেলেন।গিয়ে দেখে রসিদ মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে।তারপর দুই বন্ধু মিলে তার চোখে মুখে জল দিলে, জ্ঞান ফিরে আসে।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর রসিদ তখন বলে উঠে আমি কোথায়?

-------'হিজল বনে।আব্দুল জবাব দেয়।

সেই হিজল বন আজ আছে। আছে তাকে ঘিরে নানা রহস্যও।তার রহস্য উদঘাটনে প্রথম যখন শাহপুর গ্রামে পা রাখি তখন আমার সামনে এক উদ্ভ্রান্ত যুবক দেখি এগিয়ে আসে।

আমি তাকে দেখে প্রথম অবাক হয়ে গেছিলাম।আমি তার মাথা ভর্তি উসকোখুসকো চুল দেখে প্রশ্ন করেছিলামঃ আপনি কি এ গ্রামেরই লোক?

----হ্যাঁ,কেন বলুন তো?যুবকটি বলে!

--------আমি আপনার সাহায্য চায়।

-------সাহায্য,কিসের বলুন তো?

-- তখন আমি বলি, দেখুন! আমি এই বিল নিয়ে কিছু লিখতে চায়।তাই কিছু অজানা বিষয়

সম্বন্ধে সঠিক তথ্য আমার জানা দরকার ।সে জন্য এমন একজনকে আমার দরকার যে সঠিক তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করবে।

আমার কথা শুনে সেই অপরিচিত যুবক আমাকে তখন বললঃ আপনিকি তবে সাংবাদিক না কবি?

বললামঃ দুটোই।

----- তবে একটা শর্ত আছে বাবুজি!

------শর্ত?আমি বললাম।

-----হ্যাঁ,বাবুজী।

-------- কি শর্ত শুনি।

তারপর তিনি যা বললেন তা খানিকটা অবাকই বটে।

----বললেন হিজল বিলের সংলগ্ন এই যে সব গ্রাম গুলি দেখছেন তারা সকলেই আপনার গল্প উপন্যাসের চরিত্র!

---এই যেমন আমি।এই বলে যুবকটি আমার কথার প্রত্তুরের প্রতীক্ষায় চুপ করে চেয়ে আছে।

এই বলে তিনি তার জীবনের যে গল্পটি আমাকে বলেন তা ঠিক এই রূপঃ

দ্বিতীয় পর্বঃ

যুবকটির নাম সাগর সেখ।সংক্ষেপে সাগর।সে ভালোবাসত সাথী কে।সাথী ছিল ওই গ্রামের সম্ভ্রান্ত মির্জা পরিবারের মেয়ে।আজ থেকে সাতাশ বছর আগে কারুল বিলের পদ্মঘাটে, পদ্মফুল তুলতে এসে দুজনের পরিচয় হয়।

সাথী কারুল বিলে কয়েকজন বান্ধবীর সাথে পদ্মফুল তুলতে এসেছিল।কারুল বিলের অথৈ জলে ভাসমান নীল,লাল,সাদা পদ্মফুল দেখে সে নিমেষে অবাক হয়ে যায়।বিস্তৃত কারুল বিলের কাজল কালো জল দেখে তার মনে সহসা ভয়ের উদ্রেক হয়।গভীর জলের তলায় প্রাণ নাশক জন্তুর কাল্পনিক চিত্র তার মনের মনিকোঠায় ভাসতে থাকে। রহস্যময়ী সেই কারুল বিলের জলে সাহস করে কোন বান্ধবীই তার পছন্দের পদ্মফুল তুলতে রাজি না হওয়ায় সাথীর মন তখন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়।এমন সময় চোখে পড়ে নাদুসনুদুস ফর্সা সুন্দর এক যুবককে। জল ভাঙচুর করে কারুল বিল থেকে সে উঠে আসছে। মাথায় তার লাল গামছার পাগড়ি। হাতে কিছু ফাড়ি, মেথি লম্বা যাতীয় ঘাস।তখন সবাই কৌতূহল বশতঃ তার কাছে এগিয়ে আসে।সাগর একদল মেয়েকে কাছে আসতে দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে যায়।মেয়েরা তখন তার মনের অবস্থা বুঝে সবাই এক সঙ্গে হাসতে থাকে।

তাদের সে হাসি দেখে সাগরের মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠে। সাথীর এক বান্ধবী সায়রা বলে উঠেঃ

"বন্ধু আমাদের দেখে ভয় পেলে চলবেনা, আমরা শাহাপুর গ্রামের মেয়ে। হাইস্কুলে পড়াশুনা করি।আমরা কারুল বিলে দেখতে এসেছি।আমাদের প্রিয় বান্ধবী সাথীর খুব প্রিয়ফুল পদ্ম।তুমি যদি তুলে এনে দাও তাহলে আমরা খুব খুশি হই।"

সাগর এই প্রথম কোন এক মেয়ের মুখে 'বন্ধু' কথাটি শুনে বড়ই অবাক হয়।এর আগে তো কেউ কখনও তাকে এমন প্রাণ ভরে 'পদ্মফুল' তুলতে অনুরোধ করেনি।তাই তাদের সে প্রাণ ভরা অনুরোধ সাগর উপেক্ষা করতে পারেনি।কোমরে গামছা বেঁধে জলে ঝাঁপ মেরে পানকৌড়ির মত সাঁতার কেটে কারুল বিলের মধ্য বরাবর গিয়ে, জলাশয়ের ঘাস ভেঙে অনক গুলি লাল,নীল সাদা পদ্মফুল তাদের তুলে এনে দেয়। সবাই তখন খুশি হয়ে তার নাম জিজ্ঞেস করে।তাদের উচ্ছল কৌতূহল দেখ খানিটা সে অবাকই হয়।

সাগর বলে, ' কেন নাম শুনে কি হবে? পদ্মফুল চেয়ে ছিলে পেলে,এখন নাম জেনে আবার কি হবে?

সায়রা বললঃ তুমি নাম না বললে আমাদের প্রিয় বান্ধবী সাথী যে ভাই কাউকে আস্ত রাখবেনা।

------ সাথী! কে সাথী , সাগর জানতে চাইল।

------- সায়রা মুচকি হেসে বললঃ বাঃ বন্ধু বাঃ,

তুমি আমর নাম জানতে চাইলে না অথচ আমাদের সকলের প্রিয় বন্ধবী সাথী কে জানতে চাইলে!

তোমার নাম বুঝি সায়রা? সাগর জানতে চাইলো

সায়রা বললঃ ঠিক শুনেছ।

এবার বন্ধু তোমার নাম জানতে পারি কি?পরিচয় না পেলে ইনাম দেব কি করে?

সাগর বললঃ সে আর দরকার হবে না,শুধু সাগর সেখ জানলেই হবে।

সুচিত্রা,হাসিনা, অলিদা ফাল্গুনী, সাথী সবাই তখন সাগরের পরিচয় পেয়ে খুশি হল।

সাথী তখন সাগরকে বললঃ তোমার বাড়ি কোথায়?

সাগর বললঃ শাহাপুর পশ্চিম পাড়া।

আমাদেরও তো শাহাপুর বাড়ি,দেখিনি তো কোনদিন, তুমি কি কর?সাথী জানতে চাইলো।

সাগর বললঃ আমি রে.ডিও মিস্ত্রির কাজ করি।

সবাই শুনে তার গুনের প্রশংসা করল।

সায়রা বললঃ আজ তবে চলি,আবার দেখা হবে।

এই বলে সবাই সেদিনের মতো চলে আসে।

তৃতীয় পর্বঃ

সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা বাড়ির সবাই চাই সাথী ফাস্ট ডিবিশনে পাশ করে সবাইকে চমকে দিক।সাথী মির্জা সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে।তার ভালো রেজাল্টের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার বংশের মান মর্যদা।তাই এখন থেকেই তাকে কঠিন অনুশাসন ও নিরাপত্তার মধ্যে রেখে, পিতা বাহাদুর মির্জা নবাবী মেজাজে সাথীকে সে চোখে চোখে রেখেছেন।যাতে পরীক্ষার কটা দিন সে বাইরে কোথাও না যেতে পারে।

কিন্তু বললে কি হবে, সাথীর মন পড়ে আছে, হিজলের কারুল বিলের সেই পদ্মঘাটে।যেখানে সাগরের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়।সেখানেই সাথী প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে সাগরের গলায় মনে মনে বিনিসুতোর মালা পরিয়ে দিয়ে এসেছে ।সেই থেকে তার মন সাগরে মজে আছে।বাড়ির কঠোর নিরাপত্তা ঘেরাটোপে বন্দি থেকে এই কদিনে সাথী কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠেছে।

বইয়ের পাতায় মুখ রাখলেই সাথীর দুচোখে ভেসে উঠে সাগরের সেই অনিন্দ্য সুন্দর গোলাপি মুখের হাসি মাখা ছবিতে।সাথী মনে মনে ভাবে তার চাচাতো বোন পারুলকে বলে, আরও একদিন সে তার বান্ধবীদের সাথে কারুল বিলের পদ্মগাটে যাবে।যদি বা সেদিনের মতো আবারও তার মনের সওদাগর সাগরের সাথে দেখা হয়ে যায়! ।এমনি সব কাল্পনিক দৃশ্য একাকী নির্জন মনে সাথ পাঁচ ভাবছে এমন সময় তার মা আঞ্জুমান মির্জা সাথীকে বলে, সাথী এই দ্যাখ হঠাৎ করে তোর আব্বুর রেডিওটা বাজছে নারে,দ্যাখতো কি হলো।

মায়ের মুখে রেডিও বাজেনা শব্দটা শুনে হঠাৎ করে সাথীর সাগরের কথা মনে পড়ে যায়।সে তো বলেছিল নিজেই সে একজন রেডিও মিস্ত্রি।

সাথীকে এক দৃষ্টে ভাবতে দেখে তার মা বলে, কিরে!কি ভাবছিস/তুই একবার রেডিওটাকে নিয়ে আমাদের পুরানো বাড়ি একবার যা না,সেখানে একটি ছেলে আমাদের জায়গায় রেডিও মেরামতির কাজ করে।তোর আব্বু ক্রিকেটের ধারা বিবারণী শুনতে না পেলে আমাকে খুব বকা দেব।তুই একবার যা না মা!লক্ষ্মী সোনা মেয়ে আমার।

সাথী তার মায়ের আদর মাখা কথায় খুব সে খুশি হয়।মায়ের কথা মত রেডিওটা নিয়ে সে পুরানো বাড়ির পথে পা বাড়ায়। সাবেক পুরনো বাড়ি গিয়ে দেখে তাদের ই মাটির চালা বাড়িতে সাগর চেয়ারে বসে একটি রেডিও সারছে।

সাথীর হাতে রেডিও দেখে সাগর যেমন ভীষণ অবাক হয় তেমনি সাথীও তাদের বাড়িতে সাগরকে দেখে রীতিমত অবাক হয়।

চতুর্থ পর্বঃ

সাথী আর সাগর,সাগর আর সাথী যেন পরস্পর দুটি পরিপূরক ভালোবাসার নাম।দুজনের জন্ম যেন দুজনার জন্যে।কে জানতো সাতাস বছর আগে এই শাহপুর গ্রামে দুই প্রেমিক প্রেমিকার জন্ম হয়েছিল! সাগর সাথী দুই প্রেমিকার কথা কেনা জানতো।সাগরের হৃদয়ে যেমন লিখা ছিল সাথীর নাম তেমনি সাথীর হৃদয়ে লিখা ছিল প্রেমিক সাগরের নাম।

প্রতিদিন চলতো গভীর গোপন ভালোবাসা।দুটি তরতাজা প্রাণের অফুরান্ত দুর্বার ভালোবাসা তলায় তলায় ভালোই চলছিল।দুটি সবুজ হৃদয় ভালোবাসার রঙিন আনন্দে দিনগুলি ভালোই কাটাছিল।

হঠাৎ সাগরের কানে ভেসে আসে মর্মান্তিক এক

দুঃসংবাদ।গাড়ি দূর্ঘটনায় তার পিতা তৈমূর সেখ মারা গেছেন।সেই শোক সংবাদ শুনে সাগরের মা উম্মেকুলসুম কান্নায় ভেঙে পড়েন।এই সময় সাগরের চাচু আব্বুরা সাগরের পাশে এসে দাঁড়ান।ছোট চাচুজান কাসেম মাষ্টার সাগরকে শান্তনা জোগান।

তারপর সাগরের পিতার সৎকার যাবতীয় কাজ সেরে একে একে যে যার সব বাড়ি ফিরে যান।

সাগর পিতার শোকে দিন দিন কেমন যেন ভেঙে পড়তে থাকে।সে সংবাদ শুনে সাগরের ছোট চাচু কাসেম মাষ্টার মশায় সাগরের মাথায় হাত দিয়ে বুঝিয়ে বলেনঃ দুঃখ করে ভেঙে পড়লে চলবে? তুমি ছাড়া তোমার মায়ের কে আছে বলো?তোমার কিছু হলে তোমার মায়ের কি হবে?নিজেকে শক্ত করো।আমরা তোমার পাশে আছি।কোন চিন্তা করনা' এই বলে তিনি সেদিনের মতো চলে গেলেন।

সাগর মনে মনে শান্তনা খুঁজতে থাকে।মনে মনে চিন্তা করলো, আমার পাশে মা আছেন,চাচুরা আছেন আর আছে আমার সাথীর নিষ্পাপ প্রেম।বাকি জীবন এই সব পবিত্র সম্পর্ক গুলো নিয়ে বেঁচে থাকব।

এমন সময় সাথী এসে সাগরের পাশে এসে দাঁড়ায়।

সাগরকে শান্তনা দিয়ে বলেঃ আমার সারাটা জীবন ও ভালোবাসা তোমার জন্য উৎসর্গ করব।যদি বাঁচতে হয় তোমার জন্য বাঁচব যদি মরতে হয় তোমার জন্য মরব।তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

সাথীর কথা শুনে সাগরও বলেঃ' আমিও তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।'এই ভাবে ওদের দুজনের সুখেই দিন কাটতে লাগল।দিন থেকে মাস,মাস থেকে বছর।

পঞ্চম পর্বঃ

একদিন হঠাৎ সাগরের চাচু সাগরের মাকে ডেকে বললেনঃ " আমি সাগরের বিয়ে পাকা করে এসেছি।শহরের মেয়ে, দেখতে সুশ্রী। ভালো বংশের মেয়ে এবং কাজেরও।"

সাগরের মা আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ" সে কি! কথা নেই,বার্তা নেই হুট করে বিয়ে পাকা করে ফেললেন?

তা,ছাড়া সাগরের ও তো একটা মতামতের ব্যাপার আছে!

এ কথা শুনে সাগরের চাচু কাসেম মাষ্টার সাগরের মাকে বলেন, " ও সব মতামত টটামত ছাড়োতো! আমাদের ছেলে, আমরা যা বলব ও তাই শুনবে। আজ পর্যন্ত আমাদের কোন কথার অবাধ্য হয়নি।

আজও হবেনা।

তখন সাগরের মা বলেন, এটা ওর জীবনের ব্যাপার একবার সে কথা ভাবারও দরকার আছে। তাছাড়া ওর কি এমন রোজগার আছে যে ও বৌ পুষবে?

কাসেম মাষ্টার সে কথা শুনে বলেন,। "সব হয়ে যাব,ও সব চিন্তা করে কাজ নেই। আগামী 22শে এপ্রিল শুভ বিবাহ।

সে কথা শুনে সাগর রেগে মেগে অস্থির বলেঃ এ বিয়ে আমি করতে পারব না।

সাগরের না সাগরকে বোঝায়,দেখ বাবা চাচুরা তোর পিতার মতো,তাছাড়া বিয়ে তো একদিন তোকে করতে হবে,তাই বলছি তোর চাচুদের কথা তুই মেনে নে। অমান্য করিস নে।তাছাড়া চাচুরা তোর ভালোই চাই।তোদের মাথার উপর বাবা নেই।চাচারা তো আছেন।তুই তাদের কথা মেনে নে বাবা।সাগর মনে মনে ভাবে একি আর এক চরম বিপদ হাজির হল তার কাছে? কি জবাব দেবে সাথী কে সে? তার চোখের দিকে তাকাতে পারবে কি সে?কি উত্তর দেবে ভেবে সে পাইনা।রাতদিন সে চিন্তা তাকে কুরেকুরে খেতে থাকে।কোন কাজে তার মন বসেনা।ঠিক মত সে খাওয়া দাওয়া করেনা।খবর কি আর চাপা থাকে।সাথী সেই খবর ঠিক জেনে ফেলে।

একদিন সাথী সোজা সাগরের বাড়ি চলে আসে।এর আগেও সে অনেকবার এসেছে।এবার কিন্তু রীতিমত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে।সাগর সবে দুপুরের ভাত খেয়ে বিছানায় শুয়ে ভাত ঘুম দিয়েছে এমন সময় সাথী এসে হাজির।সাগরকে সম্মূখে পেয়ে সাথী জিজ্ঞেস করেঃ

"কি শুনলাম,তোমার নাকি বিয়ে হচ্ছে? আমি জানতে চাই,কথাটা সত্যি না মিথ্যা?"

সাগর সাথীর চোখের দিকে নীরবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।কি উত্তর দেবে ভেবে পাইনা।

------কি,চুপ করে আছো কেন?তবে কি আমি জানব কথাটি সত্যি?এতদিনের আমাদের ভালোবাসার প্রতিদান এই ভাবে তুমি দেবে স্বপ্নেও আমি ভাবিনি!যদি তোমার মনে এই ছিল তবে আমার জীবন নিয়ে কেন তুমি ছিনিমিনি খেলেছো?

সাগর চুপ থাকতে না পেরে বলেঃতোমার কোন কথার জবাব এখন আমি দেবনা।শুধু জেনে রাখ,আমি নিরুপায়।তুমি আমাকে ভুল বোঝনা,পরালে ক্ষমা করে দিও।তুমি লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়ে।তোমার বাবা মা ভালে চাকরি ওয়ালা পাত্র দেখে তোমার বিয়ে দেবেন।আমার কি আছে যা দিয়ে তোমাকে সুখে রাখবো!সাগর আবেগে আরও অনেক কথা সাথীকে বলতে থাকে।

সাথী তখন রেগে গিয়ে সাগরকে বলেঃ "জেনে রাখ! আমি তোমাকে আমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছি,সেখানে আমি অন্য কাউকে বসাতে পারব না।ভালোবাসার জন্য টাকা পয়সার দরকার হয়না।দরকার হয় বড় হৃদয়ের।আমি চলে যাচ্ছি।তুমি বিয়ে করে সুখে থাকো।আজ থেকে তুমি আমাকে ভুলে যেও।কিন্তু আমি তোমায় কোনদিনও ভুলবনা।আর অন্য কাউকে আমি আমার জীবন সঙ্গীও করতে পারবনা।" এই বলে সাথী বাড়ি থেকে চলে যায়।

সাগর মুখে হাত দিয়ে চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তার যন্ত্রণা কে বুঝবে! কাকে বোলবে? অন্তরের ব্যথা চেপে রেখে নিজের কাজে মন দেয় সে।অবশেষে একদিন সাগরের চাচুর দেখা কন্যার সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়।তার পর বিয়ে হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পর সাগর মনে মনে ভাবে অতীতের সব কিছু স্মৃতি সে আস্তে আস্তে ভুলে যাবে।কিন্তু অতীত কি কারো অত সহজে পিছন ছাড়ে? সাগরের বিয়ের এক বছর পর সাথীরও এক স্কুল মাষ্টারের সাথে তার আব্বু আম্মি বিয়ে ঠিক করে ফেলে।কিন্তু সাথী কোন মতে সে বিয়েতে রাজি হয়না।এমনকি তার দাদু মশায়ও বুঝিয়ে ব্যর্থ হন।সে সব কথা দাদু রহমত হাজী সব খুলে বলে সাগরকে।দাদু সাগরকে কাছে পেয়ে বলে, দেখ সাগর বিয়ে তো একদিন করতেই হবে।বিয়ে ছাড়া মেয়েদের জীবনে কি আছে বল?সরকারী চাকরি পাত্র একি হাত ছাড়া করা যায় ভাই? সুযোগ বার বার আসবে বল?তুমি বোঝাও ওকে,তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।সাগর কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলে,ঠিক আছে দাদু আমি কথা দিচ্ছি সাথীকে বোঝাব।এরপর সাগর জানতে পার সাথী বাড়িতে নেই সে তার মামাদের বাড়ি বেড়াতে গেছে।তার পর একদিন সুযোগ বুঝে সে তার দেখা করে। এবং তার পরিবারের দেখা পাত্রকে সে বিয়ে করতে অনুরোধ করে।সাথী তার এই কথা শুনে রীতিমত রেগে যায়।সাগরকে সে বলে আমি জানতে পারলাম তুমি নাকি খোঁজ নিয়েছো আমি কোথায় গিয়েছি।কেন আমি কোথায় যায় না যায় তাতে তোমার কি? আমার ক্ষতকে খুঁচিয়ে আবার তুমি ঘা করতে এসেছো?এতটা অপমান করেও তোমার আশা মিটেনি,আবার তুমি অন্যের হয়ে এসেছো দয়া দেখাতে।কারো কোন প্রয়োজন নেই আমার।এখন তুমি আসতে পারো! এই বলে সাগরকে সে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে।সাগর সেদিনের মতো আর কোন কথা বলে চলে আসে।

ষষ্ঠ পর্বঃ

বেশ কয়েক মাস পর সাথী সাগরের বাড়ি সাগরকে সে দেখা করতে আসে।সাগর সেদিন বাড়িতে একা।সাগরের বৌ ছিল বাপের বাড়ি বহরমপুরে।সাথীকে নরম সুরে বসতে বলে।সাথী ও একটি চেয়ার টেনে বসে পড়ে।সাগর বলে, সাথী তুমি ভালো করেই জানো আমাকে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে হয়েছে।

এ ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না।এবং আমি এও জানি তুমি কেন বিয়ে করতে রাজি হচ্ছোনা।কি করলে তুমি বিয়ে করতে রাজি হবে আমাকে বল?আমরা না হয় সার জীবন বন্ধু হয়ে থাকব।বিয়েটাই কি জীবনের সব কিছু?প্রকৃত প্রেমে বিয়ে হয় না।ইতিহাস পড়ে দেখ।যারা বড় বড় প্রেমিক প্রেমিকা তাদের হয় মৃত্যু হয়েছে না হয় অন্যকে বিয়ে করে সংসারী হতে হয়েছে।আমি তো আর কবি নই যে তোমাকে প্রেম ব্যাখ্যান শোনাব।আমি চাই তুমি তোমার আব্বু আম্মির পছন্দ সই সরকারি চাকরিজীবি মাষ্টার মহাশয়কে বিয়ে কর।তাতে তুমি সুখে থাকবে আমিও তোমার সুখ দেখে শান্তিতে সুখে বেঁচে থাকতে পারব।আমি তোমাকে দূর থেকে আশীর্বাদ করবো তোমাদের দাম্পত্য জীবন যেন সুখের হয়।আর আমার মতো ভাগ্য ঈশ্বর যেন কারো না করেন।তোমার যত কষ্ট যন্ত্রণা যেন আমাকে দেন।

সাগরের যন্ত্রণা মাখা কথা গুলো এক নাগাড়ে সাথী শুনে গেল।শেষে সাগরকে বললঃ আমি তোমার কথা রাখবো কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।

সাগর বলেঃ' কি শর্ত বলো? আমি তোমার সব শর্ত মানতে রাজি আছি।'

----------'তোমায় আমি যে জায়গায় স্থান দিয়েছি,অন্য কাউকে আমি ওই স্থানে বাসাতে পারবো না। তুমি যদি নিজের হাতে আমার হাত অন্য কারো হাতে তুলে দিতে পারো তাহলে আমি তাকে বিয়ে করবো,বলো! পারবে তুমি?আর যদি না পারো, সারাটা জীবন আমি কুমারী হয়ে থাকব।

সাগর ভেবে পাইনা এই প্রশ্নের জবাব সে কি দেবে!

এটা কি করে সম্ভব!

তার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল।এদিকে সাথীরও বিয়ের দিন কাছিয়ে এল।সেদিনটা সাগরের জীবনে সব চাইতে দুঃখের দিন ছিলো।বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে যখন বর, কনে গাড়ীতে চড়ে বসেছে, তখন সাগর ধীরে ধীরে ওদের কাছে এসে একে অপরের হাত ধরে বলেঃ 'তোমরা সারা জীবন দুই সুখ সারি সুখে থেকো।'

কিছুক্ষণ পর ওদের গাড়িটা অনুষ্ঠান বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সাগর অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।মনে মনে ভাবে ' ঈশ্বর মানুষকে হৃদয় কেন দেয়! আর কেনই বা যন্ত্রণা দেয়?কেন বার বার অতীত ফিরে আসে?ভুলতে চাইলেও কেন ভোলা যায় না?আজ পঁচিশ বছর পর সাথী কি সাগরের কথা মনে রেখেছে? নাকি সময়ের সাথে চলতে গিয়ে সাগকে ভুলে গেছে? এই সব হৃদয় বিদরক প্রশ্ন সাগরের মাথায় যখন বারবার কুন্ডলী পাকিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলছে তখন কাকের ডানায় ভর করে

সন্ধ্যা নেমে আসছে হিজলের কারুল বিলে।

***

বিশ্বাসঘাতক

সুনন্দ সান্যাল

প্রথম দৃশ্য

কলকাতা, বেহালা চৌরাস্তা, রাজা রামমোহন রায় রোডের প্রাসাদপোম রায় ভিলা। ভোরবেলা, চর্তুদিকে পাখিদের গুঞ্জন, বসন্তকালের নাতিশীতোষ্ণ মনোরম আবহাওয়ার মাঝে ছোট মাঝারি টবে প্রতিষ্ঠিত হরেকরকম গাছ দ্বারা সুসজ্জিত দ্বিতীয় তলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা পান করছে বছর পঁচিশের সুদর্শন, সুস্হ চেহারাসম্পন্ন এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ এক যুবক পরণে সাদা অ্যাডিডাস ফুলহাতা টি শার্ট এবং অ্যাডিডাস সাদা ট্রাউজার। চা পানরত অবস্হায় সেই যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সুন্দর একটা প্রজাপতি। একটি টবে প্রতিষ্ঠিত ফুল গাছের পাতায় বসেছিলো প্রজাপতি। মুখে একরাশ সুখানুভূতি মাখা হাসি নিয়ে চা পান শেষ করে বারান্দা ছেড়ে নিজ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলো যুবক। ঘরের একপাশে রেখে দেওয়া ক্রিকেট স্পোর্টস কিট ব্যাগটা নিজের পিঠে চড়িয়ে ঘর থেকে প্রস্হান করলো। বাড়ির অভ্যন্তরে সিঁড়িতে একপ্রকার দৌড় এবং লাফের মাধ্যমে দ্বিতীয় তল থেকে প্রথম তলে নেমে এলো যুবক। সে সিঁড়ি থেকে নেমেই বাঁ দিকের দেওয়ালে চাবি হোল্ডার থেকে একটা চাবি নিয়ে ট্রাউজারের বাঁ পকেটে রাখলো। একতলার খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা প্রাতঃকালীন খাবার খাওয়া শেষ করার পরে ঝড়ের গতিতে অ্যাডিডাস পারফরমেন্স লো কাট রানিং মোজা এবং কুকাবুরা কাহুনা প্রো টু পয়েন্ট ও স্পোর্টস জুতো পড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। বাড়ির লাগোয়া জমিতে সুসজ্জিত গাছগুলোতে জল দিয়ে পরিচর্যা করছিলো ছাপা শাড়ি পরিহিত একজন বছর পঞ্চাশের মহিলা।

- রেখা মাসি, আমি জলখাবার খেয়ে নিয়েছি। বাবা-মা ঘুম থেকে উঠলে বলে দিও আমি প্র্যাক্টিস করতে চলে গেছি। দুপুরে ফিরতে দেরি হবে। গতকাল রাতে দুজনে দেরি করে বাড়ি ফিরেছে তাই সকালে আর ডাকলাম না। দুপুরে মা আর তুমি দুজনেই খেয়ে নিও। আমি এসে খাবো।

- তুমি ঠিক করে খেয়েছো তো ছোট দাদাবাবু? আমায় একবার ডাকবে তো! আমি গাছে জল দিতে গিয়ে তোমার খাবারটা দেখতে পারলাম না।

- উফফ্! রেখা মাসী তুমি একদম চিন্তা করো না, আমার যতটা খাওয়া উচিত ততটাই খেয়েছি। তুমি তোমার কাজ এগিয়ে নাও এইবেলা। ওরা দু জন ঘুম থেকে উঠলেই তো রেখা এইটা দাও, রেখা ওইটা করো অর্ডারের বন্যা বইয়ে দেবে।

বাড়ির ভিতর থেকে একটা মহিলা কন্ঠস্বর ভেসে এলো

- রেখা, রেখা কোথায় তুমি? সামনে এসো।

- হ্যাঁ, আসছি দিদিমণি।

- ওই দেখো মায়ের ঘুম ভেঙে গেছে। তুমি মায়ের কাছে যাও। আমি আসছি। মাকে বলে দিও।

- হ্যাঁ বলে দেবো। সাবধানে যাবে ছোট দাদাবাবু। দুগ্গা দুগ্গা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

দক্ষিণ কলকাতা, লেক কালীবাড়ি অঞ্চল, সমরেশ মুখার্জী ক্রিকেট কোচিং সেন্টার।

সেন্টার নেটে ব্যাটিং অনুশীলনে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছে বছর বাইশের একজন ছয় ফুট উচ্চতাসম্পন্ন যুবক। উপস্হিত দর্শকদের কাছে মূল আকর্ষণ এই যুবকের ব্যাটিং অনুশীলন। ইতিমধ্যে একটা লাল রঙের মারুতি সুজুকি অল্টো কে টেন গাড়ি এসে কোচিং সেন্টারের সামনে এসে থামলো। চালকের আসনের পাশের আসন থেকে গাড়ির দরজা খুলে নামলো প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব, বেশ স্বাস্হ্যবান একজন ব্যক্তি। ব্যক্তিটি সোজা হেঁটে সেন্টার নেটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

- সাহেব, session complete করে আমার সাথে club tent এর অফিস ঘরে একবার দেখা করিস। জরুরি কথা আছে। Practice, practice hard, you can win every battle.

সাহেব অনুশীলনে আরও গভীর মনোনিবেশ করলো। প্রায় ঘন্টাখানেক ব্যাটিং অনুশীলন করার পরে সাহেব মাঠের একপাশে সবুজ ঘাসের ওপর বসলো। হাতের গ্লাভস্ খুলে একটা পাঁচশো মিলিলিটারের জলের বোতল থেকে অনেকটা জলপান করার পরে সাহেব ধীরে ধীরে অফিস ঘরের অভিমুখে হাঁটতে শুরু করলো। অফিস ঘরে ঢোকার মুখে একজন সাহেবের সমবয়সী, সুদর্শন, পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট এক যুবক সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালো।

- Best wishes Bro, আমার মন বলছে ভালো খবর। সেই জন্যেই সমরেশ স্যার তোকে আলাদা করে ডাকলো। খাওয়াতে হবে, না হলে ছাড়বো না।

- আরে আগে খবরটা শুনতে তো দে। অন্য কিছুও তো হতে পারে। আর party তো কাল এমনি হবে, after all its my birthday tomorrow, right Vikram!

- Oh! Yay! Certainly. Party তো বান্ তা হেঁ।

সাহেব অফিস ঘরে প্রবেশ করলো।

তৃতীয় দৃশ্য

- সাহেব, এসো, please come, take your seat. তোমার জন্য তো বটেই, সমগ্র বাংলার জন্য, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের জন্য good news বা breaking news হলো এই মূহুর্তে, বাংলা ক্রিকেট দলের নির্ভরযোগ্য all rounder সাহেব রায়, upcoming Indian Premier League এ Mumbai Indians দলে যোগ দিতে চলেছে।

- Sir, did I hear correctly!

- হ্যাঁ, একদম ঠিক শুনেছিস। আগামী পরশু যখন practice session এ আসবি তখন কয়েকটা formalities Mumbai Indians management এখানে সেড়ে নেবে। চলতি সপ্তাহে শুক্রবার তোকে বিমানে উড়ে যেতে হবে মায়ানগরী মুম্বাইতে। Management পুরোটা সামলে নেবে। তুই শুধু খেলায় মনোনিবেশ কর।

- আমার তো এখনও dream মনে হচ্ছে।

- এই হচ্ছে তোদের নিয়ে সমস্যা। রঞ্জিতে আকর্ষণীয় performance, নিজ দক্ষতায় ব্যাটে রান পেলি, উইকেট পেলি, you are a highly deserving candidate from Bengal, তোর তো এটা স্বাভাবিক প্রত্যাশার মধ্যে থাকা উচিত। Plus ওরা তো তোর ট্রায়ালও নিয়েছিলো। প্রত্যাশা পূরণ করতে অনুশীলন আর দক্ষতা প্রয়োজন। শোন, দলটার নাম Mumbai Indians, মাথা নত করে শচীন, জয়বর্ধনেদের থেকে শিখবি আর প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে নিজের সেরাটা দিয়ে লড়াই করবি। একটা ম্যাচেও যদি সুযোগ আসে তাহলে ওই একটা খেলাই হবে তোর প্রমাণ করার সুযোগ। যা এখন বাড়ি যা, আনন্দ কর। তবে অতি আনন্দ করিস না। Anyways happy birthday in advance. Birthday gift টা পরশুদিন দেবো।

সমরেশ মুখার্জীকে প্রণাম করলো সাহেব।

- Thanks Sir. আপনি না থাকলে এতোটা এগোতে পারতাম না।

- থাক, এই সব কথা বলার আগেও অনেক সুযোগ আসবে। আগে performance পরে dialogues হবে।

সাহেব অফিস ঘর থেকে প্রস্হান করলো।

চতুর্থ দৃশ্য

সাহেব প্যাড এবং ব্যাটিং গার্ডসগুলো খোলার পরে পোষাক পরিবর্তন করলো। তারপর গাড়ির চাবি ব্যাগ থেকে বের করে গাড়ির কাছে এগিয়ে গেলো। সাহেবকে দেখতে পেয়ে নিজের গাড়ি ছেড়ে সাহেবের গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো বিক্রম।

- Congratulations Bro! Mumbai Indians! প্রথমেই ছয় দিয়ে শুরু। আগামীকাল তোর জন্মদিন, এবার কিন্তু ঢালাও মদ আর প্লেটের পর প্লেট মাংস চাই ভাই। তার কমে কিছুতে হবে না।

- না রে ভাই। আগামীকালের অনুষ্ঠানে মদ রাখবো না। সামনে এতো বড়ো একটা সুযোগ কোনভাবেই focus টা নষ্ট করতে চাই না। বাড়িতে আয়, মাংসের ভালো পদ রান্না করে খাওয়াবো। আমি নিজেই রান্না করবো। সত্যি, তোরা সবাই আমার পাশে না থাকলে আমি এই সুযোগ পেতাম না।

- এইসব সেকেলে মার্কা নীতি কথা তুই নিজের কাছে রাখ। সবাই পাশে নয়, শুধু সোনিকা তোর পাশে আছে বলে তুই সুযোগটা পেয়েছিস।

- কি বলছিস কি বিক্রম! ভেবে চিন্তে কথা বল।

- আমি কি নিজে থেকে বলছি কথাটা? সবাই বলছে। আমি ভালো বন্ধু হিসাবে তোকে জানিয়ে রাখলাম।

- কি বলছে সবাই?

- ওই আর কি! বুঝিস তো সব, তুই একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলে, সোনার চামচ মুখে জন্ম, সোনিকারও একই background, সোনিকা IPL tournament এর broadcasting channel এর host. বন্ধুত্বের সম্পর্কের থেকেও কিছু বেশি সম্পর্ক তোর আর সোনিকার এইসব আর কি!

- ও তাহলে আমার পারফরমেন্স টা ফালতু তাই তো? এক হাজারের ওপর রান, একত্রিশ টা উইকেট সব ফালতু! এই রান আর উইকেটগুলো সোনিকা পাইয়ে দিয়েছে?

- আরে Bro, chill কর। লোকের কথায় চটছিস কেন? তোর পারফরমেন্স ফালতু হবে কেন? মাথা ঠান্ডা রাখ। তবে এটাও তো সত্যি যে শুধু performance, ability এইসবের সঙ্গে বর্তমান সময়ে backing, reference, push করা ব্যাপারটা সমানভাবে প্রয়োজন। এটা not only our sports ভাই, প্রতিটা industry তে এটাই তো চলছে। আমার এক cousin এর অফিসে under performer রা promotion পেয়েছে, কি করে হয় বল এগুলো। যাই হোক, বাদ দে ভাই। মাথা ঠান্ডা কর। আর কালকের প্রস্তুতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা কর। আমি কিন্তু কাল সকালের জলখাবার থেকে রাতের ডিনার তোর বাড়িতেই পাত পেড়ে বসবো।

- sure Bro! সকাল সকাল চলে আয়।

- সাহেব, কথাগুলো বললাম বলে please ইয়ার কিছু মাইন্ড করিস না। আর হ্যাঁ, congratulations and best wishes! আর সাথে একবার জানিয়েই রাখি happy birthday in advance Bro.

- Thanks প্রথমটার জন্য। Birthday wish at least তোর থেকে in advance নিচ্ছি না, ওটা কালকেই accept করবো যখন তুই প্রতিবারের মতো কালকেও বাড়িতে এসে আমায় wish করবি। Ok tata, bye. See you.

- Tata, see you.

পঞ্চম দৃশ্য

নিয়ম মেনে ঠিক রাত সাড়ে দশটার আগেই রায়ভিলায় রাতের খাবারের পর্ব শেষ। স্লিভলেস সাদা রঙের অ্যাডিডাস স্যান্ডো আর একটা থ্রি কোয়ার্টার পরিহিত অবস্থায় সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকালের সেই প্রজাপতির দিকে তাকিয়ে আছে। প্রজাপতিটা গাছের পাতা থেকে উড়ে বারান্দার দেওয়ালে বসে আছে। সাহেব থ্রি কোয়ার্টার প্যান্টের পকেট থেকে ফোনটা বের করলো।

- Hello, সোনিকা!

- হুমম্! বলো। Dinner complete?

- হ্যাঁ, আমার complete. তোমার?

- হ্যাঁ, complete. আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। I think I am just dying to see you in a Mumbai Indians jersey, shaking hands with God of Cricket Sachin, too much excited.

- হ্যাঁ, আমারও একই অবস্থা। But I have to concentrate on my assignment more. এইসব মূহুর্তগুলো আসবে যাবে।

- That's like my boy. Uncle, aunty শুনে কি বললেন?

- খুব খুব খুশি। বাবা তো industry friends দের ফোন করে খবর দিয়েছে। মা তো social media তে post share করে একাকার কান্ড। Media র কাছে খবর গেছে। তবে আমি এখন Media কে entertain করিনি। ওটা মুম্বাইতে পা রেখে practice session করার পরে যদি management approval দেয়... তাও করার ইচ্ছা নেই। আগে কিছু করে দেখাই IPL এর big stage এ, তবে না media. তবে একটা কথা বলবো সোনিকা?

- বলো।

- বিক্রমের সাথে আজ কথা হলো, আমার এতো দিনের বন্ধু, আজ stranger মনে হলো।

- কি বলেছে বিক্রম! তুমি সুযোগ পেয়েছো courtesy আমি, তাই তো?

- তুমি জানলে কি করে?

- বিক্রম আমায় ফোন করেছিলো। আমার কাছে sorry চেয়েছে। সাহেব তোমায় বুঝতে হবে, বিক্রম তোমার ভালো বন্ধু অবশ্যই but he's still human being. Three Idiots সিনেমাতে দেখেছিলে রাঞ্চো যখনই প্রথম হতো, ফারহান এবং রাজুর মন খারাপ হতো। কিন্তু ওরা তিনজন ভালো বন্ধু। বিক্রম ভালো ছেলে, আমি বিশ্বাস করি।

- Love you Sonika, তুমি অনেকটা চিন্তা কমিয়ে দিলে। IPL এর মতো international exposure..আমি..

- তুমি পারবে আমার হিরো, তুমি পারবে। Stress নিও না ডার্লিং, be calm and relax.

- সোনিকা, তোমার মনে আছে আমরা দুজনে একসাথে একটা red jasmine flower plant কিনেছিলাম?

- oh yes, Certainly! How can I not remember! লেক মার্কেট, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, সেদিন দুজনেই বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম। গাছটা কিনে তোমার ঘরের বাইরের বারান্দায় একটা টবে রেখেছিলাম। ওই মূহুর্তগুলো how can I not remember, how can I!

- সেই গাছটার পাতায় আজ ভোরবেলা একটা সুন্দর প্রজাপতি বসেছিলো। আমি সেই দৃশ্য দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। আর আজকেই এই সুখবরটাও কনফার্ম হয়ে এলো। প্রজাপতিটা এখনও বারান্দাতেই আছে।

- Wow! Amazing! প্রজাপতিটাকে আগলে রাখার চেষ্টা করো, উড়ে চলে যেতে দিও না।

- ফুলের সভায় আপন মনে
করতে থাকে মাতামাতি
চিন্তাভাবনার নেই অবকাশ
সঙ্গী যখন প্রজাপতি।

আমি তোমাকে একটা surprise দিতে চাই। তবে surprise টা যখন মুখোমুখি হবো তখন দেবো।

- হুমম্! বুঝলাম cricketer cum কবি ডার্লিং। এখনও এক ঘন্টা মতো বাকী আছে, আর তোমার birthday surprise টাও বাকী আছে। আমি তোমায় ঠিক রাত বারোটায় surprise দেবো। Till then আমায় তোমার ভাবনায় রাখো। এখন ফোনটা রাখলাম। Ok.

-ok.

ষষ্ঠ দৃশ্য

ফোনটা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্টের পকেটের ভিতরে রেখে দিলো সাহেব। সে বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে খাটের ওপর বসলো। খাটের পাশে টেবিলে রাখা জলের বোতল থেকে বেশ কিছু পরিমাণ জল পান করে বারান্দার দিকে তাকিয়ে থাকে সাহেব। সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি টিকটিকি, টিকটিকি ধীর গতিতে প্রজাপতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। প্রজাপতির বিপদের আশঙ্কা ঘনীভূত হওয়ার আঁচ পেয়ে সাহেব তড়িৎ গতিতে বারান্দায় ছুটে যায় এবং দুই হাতের তালু ব্যবহার করে হাততালি দেয়। হাততালির শব্দ হওয়ার পরে টিকটিকি নিজের অভিমুখ বদল করে এবং প্রজাপতি উড়ে সাহেবের চোখের আড়াল হয়। সাহেব ঘরে ফিরে এসে বিছানায় বালিশের সাহায্যে নিজের শরীর অর্ধেক শোয়া অবস্হায় রেখে বাঁ হাত দিয়ে নিজের চোখ আড়াল করে বিশ্রাম নেয়। ওই আধ শোয়া অবস্হায় সাহেব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। রাত বারোটার সময় ফোনে আসা বেশ কিছু নোটিফিকেশন সাহেবের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়নি।

ভোরবেলা পাঁচটার সময় সাহেবের ঘুম ভাঙলো। ঘুম থেকে উঠে ঘরের একপ্রান্তের দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় নিজেকে দেখছিলো সাহেব।

- শুভ জন্মদিন সাহেব। তোর সামনে বড় সুযোগ এসে গেছে, এই সুযোগটা জন্মদিনের সবথেকে বড় উপহার। তোকে বড় কিছু করে দেখাতেই হবে। অনুশীলনে কোনও আপোষ নয়। আরও শিখতে হবে। বছর শেষে তোর লক্ষ্য ভারত জাতীয় দলের test jersey. তুই পারবি,পারতেই হবে। আর হ্যাঁ, সোনিকা, ভালোবাসা, দায়িত্বপালন। বিবাহের প্রস্তাবটা আজ দেবো। সুস্হ, স্বাভাবিক থাকবো, সৎ পথে থাকবো।

আয়নায় নিজের সঙ্গে কথাগুলো বলা শেষ করে ঘর লাগোয়া বারান্দাটার দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ সাহেবের খেয়াল হয় প্যান্টের পকেটে ফোনটা রাখা আছে। পকেট থেকে ফোনটা বের করে ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখলো সাহেব। তারপর ফোনটা চার্জে বসিয়ে স্মিত হাসি হাসলো।

- sure ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, মুম্বাই থেকে flight এ যত কম সময়েই কলকাতায় আসুক না কেন, ক্লান্তি আসাটা স্বাভাবিক। ঠিক আছে আর তো কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা তারপর তো সারাদিন একসাথে।

ঘর লাগোয়া শৌচালয়ে প্রবেশ করলো সাহেব।

সপ্তম দৃশ্য

রায়ভিলার একতলায় বসার ঘরের সোফায় বসে খবরের কাগজের খেলার পাতায় শিরোনামগুলোতে চোখ রাখছিলো সাহেব। হঠাৎ সাহেবের ফোন বেজে উঠলো। ফোনের পর্দায় নজর রেখে সে দেখলো একটা অপরিচিত নম্বর থেকে ফোনটা আসছে।

- Hello!

- Hello! আমি সাহেব রায়ের সাথে কথা বলছি right?

- হ্যাঁ, বলছি। বলুন।

- আমি লেক থানার আই সি সৌরজ্যোতি গুহ কথা বলছি।

- হ্যাঁ, বলুন।

- আপনি সোনিকা সিংহ এবং বিক্রম বিশ্বাস নামে কাউকে চেনেন?

- হ্যাঁ, বিক্রম বিশ্বাস আর আমি বাংলার রঞ্জি দলে সহ খেলোয়াড়। সোনিকা সিংহ আমাদের বন্ধু। কেন স্যার কি হয়েছে?

- আপনি kindly যদি একটু পি জি হাসপাতালে চলে আসতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়। আমাদের কয়েকটা তথ্য প্রয়োজন। ওহ! আপনাকে জানিয়ে রাখি, আজ ভোররাতে বিক্রম বিশ্বাস মদ্যপ অবস্হায় গাড়ি চালানোর কারণে লেক মার্কেটের কাছে লোহার road divider এ সজোড়ে ধাক্কা মেরেছেন।

- What? Are you serious officer?

- Yes, certainly! এবং চালকের আসনের পাশের আসনে বসেছিলেন সোনিকা সিংহ। দুজনেই আশঙ্কাজনক অবস্হায় পি জি তে ভর্তি হয়েছেন। গাড়িতে কয়েকটি gift pack ছিলো সেই gift pack এ সাহেব রায় নামটা দেখলাম and সোনিকা সিংহের last call এও সাহেব রায় এবং contact number টা দেখলাম। আপনি আসছেন তো?

- হ্যাঁ, officer আমি আসছি।

ফোনটা হাতে নিয়ে সোফার ওপরে বসেছিলো সাহেব। চোখের কোণ থেকে এক দু ফোঁটা জল গাল বেয়ে নিচে নামছিলো। বাড়ির গৃহ পরিচারিকা রেখা সাহেবকে এই অবস্হায় দেখে সাহেবের বাবা মায়ের ঘরের দিকে ছুটে গেলো। সাহেবের বাবা মা দুজনে টি ভি তে এই দুর্ঘটনার সংবাদেই নজর রেখেছিলো।

- বড় দাদাবাবু, দিদিমণি, এক্ষুণি বসার ঘরে চলুন। ছোট দাদাবাবু কাঁদছে মনে হলো।

সাহেবের বাবা - মা দুজনেই সময় বিলম্ব না করে বসার ঘরে প্রবেশ করলো।

- আমরা দেখলাম টি ভি তে। যতক্ষণ না শেষ বলটা খেলা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত খেলায় দুই দলই জিতে থাকে রে সাহেব। Get ready. তোর পাশে আমি তোর বাবা আছি, মা আছে, দেখ তোর রেখা মাসি, আমরা সবাই আছি। আমি আর সুচ্ছন্দা যাবো তোর সাথে, ঈশ্বরকে স্মরণ কর। চল। Be steady.

নবম দৃশ্য

পুলিশ অফিসার সৌরজ্যোতি গুহ সাহেব রায়ের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে।

- সোনিকা সিংহের parents আপনার সাথে কথা বলতে চায়। অসহায় অবস্হায় আপনাকে খুঁজছে। আমি যদিও বলিনি যে আপনি হাসপাতালে এসেছেন।

- Thank you officer. আমি আপনাকে বিক্রমের মাদুরদহের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। বিক্রমের বাবা কোভিডের সময় গত হয়েছেন। অন্তত আশা করবো বিক্রমের বৃদ্ধা মাকে কোনরকম যন্ত্রণায় ফেলবেন না।

- সেই ভরসাটুকু রাখতে পারেন।

- Thanks officer! আমি চলতি সপ্তাহে IPL খেলতে মুম্বাই চলে যাবো। একজন বাংলা দলের রঞ্জি খেলোয়াড় হিসাবে এই সুযোগটা যে হাতছাড়া করা বোকামির সমান সেটা অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন। আমার সামনে bright future.

- Yes, বুঝতে পারছি। সেই কারণেই তো বলিনি যে আপনি হাসপাতালে এসেছেন। Congratulations and best wishes! Oh! Happy birthday Saheb, wishing you a healthy year full of tonnes of accomplishments.

- Thank you so much officer. এইরকম গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাহেব রায় নামটা এইরূপ ঘটনার সাথে যুক্ত হলে আমার career শুরুর আগেই শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই আমি আমার contact list থেকে সোনিকা সিংহ এবং বিক্রম বিশ্বাসের নাম delete করলাম। সোনিকা সিংহের parents দের নম্বর block করে দিলাম। বাকীটা আপনার দায়িত্ব, আপনি বুঝে নেবেন। অপরাধীর যেন শাস্তি হয়। ইডেন গার্ডেনসের ক্লাব হাউসে এবং ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ভি আই পি লাউঞ্জে আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য আই পি এলের টিকিট বুক করা থাকবে। আজ আসছি। আশা করছি, এই তদন্তের জন্য আর আপনি আমায় ফোন করে বিরক্ত করবেন না। প্রয়োজন হলে আমি যোগাযোগ করবো। Thank you Officer, thank you so much.

সাহেব গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে চৌরাস্তার রায়ভিলার অভিমুখে গাড়িটা ছুটে গেলো।

পনেরো দিন পরে.....

সাহেব রায় IPL এ একটি খেলায় সুযোগ পেয়ে 33 Runs (15 balls) করেছে এবং বল হাতে 3 overs 21 runs দিয়েছে। সেই খেলায় Mumbai Indians Delhi Capitals এর বিরুদ্ধে জিতেছে। আরও কয়েকটি খেলায় সুযোগ পাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিক্রম ও সোনিকা সঙ্কটজনক অবস্থা পেরিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার পথে। সোনিকার বাবা মা সাহেবের সঙ্গে, সাহেবের বাবা মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের প্রবল চেষ্টা এবং ব্যর্থতা প্রাপ্তি শেষে এখন সব আশা ছেড়ে শুধুমাত্র মেয়ের সুস্থতার কামনায় ব্রতী হয়েছে। সোনিকা তাঁর বাবা মায়ের মুখ দেখে বুঝতে পারে যে সাহেব তাদের সাথে আর কোন যোগাযোগ রাখে না।

পুলিশ প্রশাসন বিক্রমের সম্পূর্ণ সুস্থতার অপেক্ষা করছে।

***

জ্ঞানের কথা(G.K.)

লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ডালহৌসিতে আজও রয়েছে একটা কাঠের খেলনা। খেলনাটির নাম টিপুর বাঘ। ব্রিটিশ এক সৈন্যের কলার টেনে ধরে আছে একটা ভয়ানক হিংস্র বাঘ। এটা কিন্তু কোন মামুলি খেলনা নয়। বাঘটার শরীরের ভিতরে রয়েছে একটা পাইপ অর্গান। আর হাতলটা ঘুরালে শোনা যায় বাঘের গর্জন সাথে সৈনিকের আর্তনাদ। আবার সৈনিকের হাতটা উঠানামা করে। ১৮ শতকে এ ছিল একেবারে অত্যাধুনিক পদ্ধতি। এই বাঘ আসলে টিপু সুলতানের প্রতীক। তিনি নিজেইতো ছিলেন মহীশুরের বাঘ। আর তার প্রতীকী বাঘই যেন খতম করে ফেলছে শত্রু ইংরেজদেরকে। শ্রীরঙ্গপতন যুদ্ধে যখন টিপু সুলতানের মৃত্যু হয় তখন ব্রিটিশরা এই খেলনা উদ্ধার করে নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। সঙ্গে করে নিয়ে যায় টিপুর বাঘ, খোদাই করা সোনার সিংহাসন, তলোয়ার আরও কত কি। সোনার সেই সিংহাসনটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে এক একটা টুকরো এক একজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বড় বাঘের মাথাটা উপহার দেওয়া হয় রাজা তৃতীয় জর্জকে। আর সিংহাসনের মাথায় মনিমানিক্য বসানো সেই পাখিটা সেটা দেওয়া হয় কুইন কারলটকে। সব দামি দামি জিনিসপত্র নিমেষের মধ্যে সকলে পকেটে পুড়ে দেওয়ার পর বাকি রয়ে গেল এই খেলনাটা। এটাকে তো ভেঙে চুরে আর কোন দাম পাওয়া যাবে না। তাই এটা জায়গা পেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লিডেন হলের মিউজিয়ামে। টিপু সুলতান ছিলেন ব্রিটিশদের ত্রাস।

সেই টিপুকে নিয়ে অনেক রকমের রং মেশানো হিংস্র বর্বর কাহিনী ব্রিটেনে তখন লোকের মুখে মুখে ছিল। বাচ্ছারা দুষ্টামি করলে ব্রিটিশ ম্যামরা তাদের বলতো আর একটু দুষ্টামি করলে কিন্তু টিপসুলতান চলে আসবে। তাই টিপুর সেই খেলনা ব্রিটিশরা মিউজিয়ামে রেখে দেশবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন দেখো ভাই মহিশুরের সেই টিপু সুলতান কতটা ভয়ংকর ছিল। দেখো আমাদের সৈনিকের মৃত্যু নিয়ে সে খেলনা বানিয়েছে। বহু বছর এক এক মিউজিয়াম ঘুরে সেটা এসে পৌঁছায় ভিক্টোরিয়ার মিউজিয়ামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জমান ব্রেশটের কবলে গোটা ব্রিটেন। লন্ডনে ক্রমাগত বোমা ফেলছে হিটলারের নাৎসি। এমন সময় চরম বোমায় ধসে পড়ল সেই মিউজিয়ামের ছাদ। আর টিপুর বাঘের উপরই পরল। খেলনার উপরের কাঠের অংশটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাও খুব যত্ন করে ঠিকঠাক করে আবার মিউজিয়ামে ফেরত আনা হয়। আজ সেই মিউজিয়ামের অন্যতম সেই খেলনাটা। স্কুলের বাচ্চাদের জন্য সেটা হল মাস্টার..।

(তথ্য সংগৃহীত)

হাতি শুঁড়

Heliotropium indicum Linn.

বিস্তৃতি: সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ।
বর্ণনা: একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে বেড়ে ওঠা বর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা একান্তর বা কখনও কখনও প্রায় বিপরীত, ডিম্বাকার-আয়তাকার, অল্প রোমযুক্ত ও উপরের দিকে কোঁচকানো। ফুলগুলি ২টি সারিতে থাকে, নিয়ত ও বৃশ্চিকাকার মঞ্জরিতে বিন্যস্ত থাকে, ছোট, অসংখ্য, বৃত্তহীন। বৃতি পাতলা রোমাবৃত, অংশগুলি অসমান। দলমণ্ডল বেগুনির আভাযুক্ত সাদা রঙের, ফানেল আকৃতির। পুংকেশর ৫টি। ফল গভীরভাবে ২টি চূড়াযুক্ত, প্রতিটি চূড়ায় ৪টি খাঁজ থাকে, ২টি কৌণিক ও ১টি বীজযুক্ত শক্ত আঁটি থাকে।
ফুল ও ফল আসার সময় : ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর।
বাস্তু সংস্থান: বনে-জঙ্গলে প্রায়ই দেখা যায়।
ব্যবহার: মূল - সাপে কামড়ালে মুল থেঁতো করে ব্যবহার করা হয়। দাদে চূণের জালের সঙ্গে মূল বেটে লাগানো হয়। মূলের ক্বাথ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তাল্পতায় খাওয়ানো হয়।

পাতা: কাঁধের ব্যথা ও ফোলায় পাতা বেটে চূণের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে উপকার হয়।বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ালে, হাত ও পায়ের সন্ধিস্থলে ফোলা ও ব্যথায়, ক্ষতস্থানে, বাতে, সর্দিকাশি সহ জ্বরে, টাইফয়েড, গলাব্যথা ও একজিমায় পাতার রস ব্যবহার করা হয়। চোখের রোগেও এটি হিতকর।

ফুল:- ফুল বেটে দেশি মদের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে ৩ মাস পর্যন্ত গর্ভবতী রমণীরগর্ভপাত ঘটে।

বংশবিস্তার: বীজের সাহায্যে।

চাষ-আবাদ: উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মাটিতে জন্মায়।

(তথ্য সংগৃহীত)

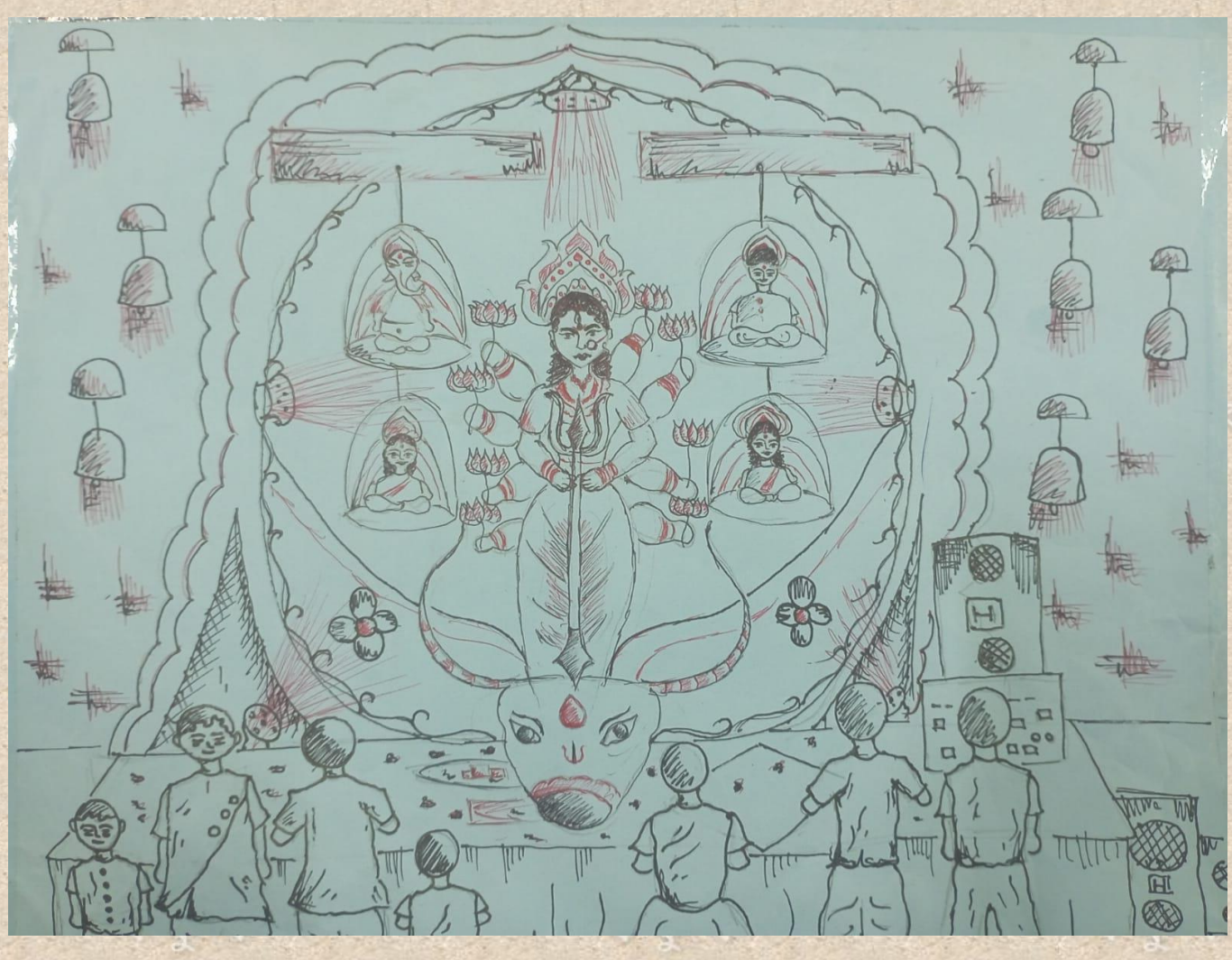

শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা সহ আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন

📲 : +91-99031 29991
📨 : boikutirkolkata@gmail.com
🌐 : https://www.boikutirkolkata.co.in

আর আমাদের Facebook খুজেঁ পাবেন “বই কুটির কলকাতা” লিখে খুঁজলেই।